সাইমুম-১৭

ব্ল্যাক ক্রসের কবলে

আবুল আসাদ

ইবুক সম্পর্কে কিছু কথা

সম্মানিত পাঠক,

আসসালামু আলাইকুম

সাইমুম সিরিজকে অনলাইনে টেক্সট আকারে আনার লক্ষ্য নিয়ে ২০১২ সালের ১৭ই আগস্ট গঠন করা হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট (SSUP) গ্রুপ। তারপর বিভিন্ন ব্লগে ও ফেসবুকে প্রোজেক্টের জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করা হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন একঝাক স্বেচ্ছাসেবক এবং এই স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট টীম। টীম মেম্বারদের কঠোর পরিশ্রমে প্রায় ৮ মাসে সবগুলো সাইমুম অনলাইনে আসে। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ওয়েবসাইটঃ www.saimumseries.blogspot.com

ফেসবুক পেজঃ www.facebook.com/SaimumSeriesPDF

ফেসবুক গ্রুপঃ www.facebook.com/groups/saimumseries

১

গেরিলা সদৃশ ওয়াট তার চাবুক থামাল। চিৎকারও থেমে গেল ওমর বায়ার। চিৎকার রূপান্তরিত হলো গোঙানিতে।

ওমর বায়ার দেহটা ওবু করে টাঙানো ঘরের ছাদের সাথে। ঝুলে পড়েছে তার দু'টি হাত নিচের দিকে। দেহ তার রক্তাক্ত। তার হাত, তার চুল বেয়ে ফোটা ফোটা রক্ত গিয়ে পড়ছে মেঝেতে।

ওয়াট তার চাবুকের রক্ত স্পঞ্জে মুছে চামড়ার তৈরী চাবুকের সাপের মত লকলকে লেজটা হাতে গুটিয়ে নিল। বাম হাত দিয়ে এ্যাসট্রে থেকে জ্বলন্ত সিগারেট তুলে নিয়ে এগুলো ওমর বায়ার দিকে। ওয়াটের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখে-মুখে চরম অধৈর্য্যের ভাব।

বাম হাতের সিগারেটটা সে চেপে ধরল ওমর বায়ার কাঁধে।

কেঁপে উঠল ওমর বায়ার দেহ। চিৎকার করে চোখ খুলল ওমর বায়া।

হো হো করে হেসে উঠল ওয়াট। মুখ বিকৃত করে সে বলল, এমন পেটানো হাতিকে পেটালেও সে কথা বলত। শেয়ালের বাচ্চা তোর মুখ খুলতে পারলাম না, তোর বিড়ালের বংশে জন্ম নেয়া উচিত ছিল।

একটু থাকল ওয়াট। তারপর গলার স্বরটা একটু নামিয়ে বলল, সামান্য দু'টো কথা বলে দিলে এসব তোর কিছুই হতো না। বল, তোর জমি জমার কাগজ-পত্র কার কাছে, কোথায় রেখেছিস? অথবা বল, ক্যামেরুনের কোর্ট থেকে তোর কেসটা তুই তুলে নিবি।

সমগ্র দক্ষিণ ক্যামেরুনের একমাত্র অবশিষ্ট মুসলিম ল্যান্ড ওমর বায়ার জমিদারী কুক্ষিগত করার এ দু'টি পথই খোলা আছে 'কিং ডোম অব ক্রাইস্ট' (KOC-কোক) এবং 'আর্মি অব ক্রাইস্ট অব ওয়েস্ট আফ্রিকা' (AOCOWA-ওকুয়া) এর কাছে। ওমর বায়ার জমি জমার কাগজপত্র যদি পেয়ে যায়, তাহলে ওমর বায়া প্রমাণ করতে পারবে না যে জমি জমা গুলো তার। তাছাড়া কাগজ-পত্র প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করে নিজেরা কাজে লাগাতে পারবে। ওমর বায়ার কাগজপত্রের যে কপি ক্যামেরুনের সহকারী সেরেস্তায় জমা ছিল তা ওকুয়া ইতিমধ্যেই গায়েব করে ফেলেছে। সুতরাং ওমর বায়ার কাছের কাগজপত্র একবার হাত করতে পারলেই কেল্লাফতে।

ওমর বায়া ধীরে ধীরে ডান হাতটা তুলে কাধের ফোস্কাটার উপর হাত বুলিয়ে বলল, তোমাদের আমি চিনি না। তোমাদের সাথে আমার কোন শত্রুতা নেই, তোমরা এসব চাও কেন?

ওমর বায়ার ঝুলন্ত হাতটার উপর ফুটবলের মত একটা লাথি চালিয়ে ওয়াট বলল, আবার বলছিস সেই একই কথা। দুনিয়ার কেউ আমাদের মিত্র নয়, আমাদের মিত্র আমাদের স্বার্থ। আমাদের স্বার্থেই 'ওকুয়া' এখন আমাদের মিত্র, আর তুই আমাদের শত্রু। এবার আমার প্রশ্নের জবাব দে।

'জবাব আমি বহুবার দিয়েছি'।

'কি জবাব দিয়েছিস?'

'তোমরা যা চাও তার কোনটাই পাবে না'।

চোখ দু'টি জ্বলে উঠল ওয়াটের। কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত হয়ে বলল, তুই কি পাগল? জংগল ভরা ক্যামেরুনের কাম্পু উপত্যকায় ১০ হাজার একর জমি বড় হলো, না তোর জীবন বড়?

'তুমি ফরাসী না?'

‘হ্যা। কেন?’

’১০ হাজার নয়, তোমার ফ্রান্সের ১০ একর জমি কি তুমি বৃটিশের হাতে তুলে দিতে পার?’

‘বৃটেন ভিন্ন রাষ্ট্র, তার হাতে আমার দেশের মাটি তুলে দেব কেন?’

‘তাহলে আমি দেব কেন?’

‘ওকুয়া’ কিংবা ‘কোক’ তো ভিন্ন রাষ্ট্র নয়। তোমার এ তুলনা ঠিক নয়।

‘ভিন্ন রাষ্ট্র নয় কেন? খৃষ্টান জাতিস্বার্থ নিয়ে ওকুয়া ক্যামেরুন ভুমি দখলের যে অভিযান চালাচ্ছে, তা পুরোপুরিই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রসূত। এ রাজনীতির উদ্দেশ্য হলো ক্যামেরুনে একক খৃষ্টান জাতি স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলিম জাতি-স্বার্থের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন করা। সুতরাং আমার যে দশ হাজার একর জমি তা শুধু জমি নয়, আমার অস্তিত্ব, আমার জাতির অস্তিত্ব। আমাকে তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, আমার জাতির অস্তিত্ব তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারি না’।

চোখ জ্বলে উঠল ওয়াটের। হাতের চাবুক নাচিয়ে সে বলল, দিতে হবে তোমাকে। ‘ওকুয়া’ নয়, ব্ল্যাক ক্রসের হাতে তুমি পড়েছ। কথা তোমাকে বলিয়েই ছাড়ব।

‘ওকুয়ার হাতে মৃত্যু একটা, তোমাদের হাতে দুইটা মৃত্যু আছে না কি?’

‘বিদ্রুপ করছ ব্ল্যাক ক্রসকে?’ চোখ থেকে আগুন ঝরল ওয়াটের। লাফিয়ে উঠল তার চাবুক। বিদ্যুতের গতি নিয়ে ছোবল মারল ওমর বায়ার দেহে। এই ছোবলে ফিনকি দিয়ে রক্ত নামছে ওমর বায়ার দেহ থেকে। আঘাতের সাথে সাথে ওমর বায়ার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে চিৎকার।

দু’হাতে বাট ধরে চাবুক চালাচ্ছে ওয়াট। ওমর বায়ার চিকার ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে এল। থেকে গেল একসময়। চোখ দু’টি তার বুজে গেল, ঝুলে পড়ল হাত দু’টি নিঃসাড় হয়ে। জ্ঞান হারিয়েছে ওমর বায়া।

থামল ওয়াট।

ঘরে দ্রুত প্রবেশ করল পিয়েরে পল। ব্ল্যাক ক্রসের প্রধান। বলল, ‘কি ওয়াট, মেরে ফেললে নাকি?’

'ও কুত্তার বাচ্চা কথা বলবে না'।

'কথা ওকে বলাতেই হবে, ওকে মেরে কোন লাভ নেই আমাদের মক্কেলদের'।

'কেন ও ব্যাটা মরে গেলেই তো সব শেষ, ওদের বংশে তো আর কেউ নেই। সুতরাং ওর জমি পাকা ফলের মত এসে পড়বে আমাদের মক্কেল 'ওকুয়া'দের হাতে'।

'সেটা হলে ভালই হতো। কিন্তু সে পথ ও ব্যাটা বন্ধ করে রেখেছে। সে আদালতে যেমন দলিল পেশ করে রেখেছে যে, সে ক্যামেরুনের আদালতে হাজির হয়ে জমি হস্তান্তর না করলে কোন হস্তান্তর দলিল বৈধ বলে গণ্য হবে না, তেমনি সে আদালতে উইল রেজিষ্ট্রি করে রেখেছে যে, তার মৃত্যু ঘটলে বা সে ৫ বছরের বেশি নিখোঁজ থাকলে তার সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি 'ক্যামেরুন মুসলিম ট্রাস্টের' হস্থান্তর যোগ্য মালিকানায় চলে যাবে। সুতরাং তাকে বাচিয়ে রাখতে হবে এবং আমরা যা চাই তা আদায় করতে হবে'। ঘরে প্রবেশ করতে করতে কথাগুলো বলল, ফাদার ফ্রান্সিস বাইক। ফাদার বাইক 'কিংডোম অব ক্রাইস্ট' (কোক) এর প্রধান এবং 'আর্মি অব ক্রাইস্ট অব ওয়েস্ট আফ্রিকা' (ওকুয়া)- এর প্রধান উপদেষ্টা।

'ও কুত্তার বিড়ালের জীবন। নিশ্চিন্ত থাকুন ও মরবে না'। বলল ওয়াট।

পিয়েরে পল ওমর বায়ার নিশ্বাস পরীক্ষা করে বলল, 'একে নামিয়ে নিতে বল ওয়াট'।

বলে পিয়েরে পল ফাদার বাইককে নিয়ে বেরিয়ে এল।

ওরা এসে প্রবেশ করল পিয়েরে পলের অফিস কক্ষে। বসল ওরা। চিন্তা করছে পিয়েরে পল।

'কি ভাবছেন মিঃ পিয়েরে?' বলল ফাদার বাইক।

'ভাবছি ওয়াট ঠিকই বলেছে শয়তানটা কথা বলবে না। বৈদ্যুতিক আসনে বসিয়েও তার কাছ থেকে বথা আদায় করা যায়নি বৈদ্যুতিক। বৈদ্যুতিক শকও যে হজম করে, বাগে আসে না, তাকে আর কি শাস্তি দেয়া যাবে?

'শয়তানটা এত শক্ত? অবিশ্বাস্য'।

‘অবিশ্বাস্য হলেও সত্য’।

‘কিন্তু কেমন করে?’

‘মুসলমানদের তো আপনি জানেন। শত্রুর হাতে মৃত্যু ওদের কাছে শাহাদাত। শাহাদাত ওদের পরম কাম্য বস্তু। মৃত্যুকে যারা এইভাবে আলিংগন করে, তাদের বাগে আনা কঠিন’।

‘তাহলে?’

‘সেটাই ভাবছি’।

‘শয়তানটা যে ব্যবস্থা করে রেখেছে তাতে তাকে রাজী করানো ছাড়া কোন পথ নেই’।

‘এই কাজটাই অত্যন্ত কঠিন। আচ্ছা বলুন তো, সবই তো আপনাদের দখলে এই দশ হাজার একর জমি না হলে আপনাদের হয় না?’

‘জমি দখল আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য হলো মুসলমানদের উচ্ছেদ করা। দক্ষিণ ক্যামেরুনের কাম্পু উপত্যকার এই দশ হাজার একর জমি আমরা ছাড়তে পারি না দু’টো কারণে। এক, মুসলমানরা বসে থাকার জাতি নয়। তারা ঐ দশ হাজার একরকে কেন্দ্র করে যে শক্তি গড়ে তুলবে, তার মোকাবিলা করা আমাদের জন্যে কঠিন হতে পারে। কারণ দক্ষিণ ক্যামেরুনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমানদের যে জমি আমরা দখল করেছি, তার আইনগত কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং মুসলমানরা যদি ঐ দশ হাজার একর এলাকাকে কেন্দ্র করে সোজা হয়ে একবার দাঁড়াতে পারে তাহলে শক্তি না হলেও আইনের যুদ্ধে তারা নামবে। সে যুদ্ধে আমরা খৃষ্টানরা পারবো না। দুই, আমরা জানতে পেরেছি ওমর বায়ার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে রাবেতা ও ওয়ামির মত মুসলিম সংস্থা। ওরা ক্যাম্প ভ্যালিতে ওমর বায়ার ঐ দশ হাজার একর জমিকে ভিত্তি করে নিরক্ষীয় গিনী ও গ্যাবন (যেখানে থেকে মুসলমানদের উচ্ছেদ প্রায় সম্পন্ন) এলাকার জন্যে শক্তিশালী একটি ইসলামী ঘাটি গড়ে তুলতে চায়। যে কোন মূল্যে এর পথ আমরা বন্ধ করতে চাই। সুতরাং ওমর বায়ার দশ হাজার একর জমি আমাদের কাছে আজ সমগ্র দক্ষিণ ক্যামেরুন, নিরক্ষীয় গিনী ও গ্যাবন এলাকার সমান মূল্যবান’।

থামল ফাদার ফ্রান্সিস বাইক।

'বুঝেছি, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। ওমর বায়ার জমি আপনাদের পেতেই হবে'। বলল পিয়েরে পল, ব্ল্যাক ক্রস-এর প্রধান।

'হ্যাঁ পেতেই হবে'।

'এবং পেতে হবে ওমর বায়ার সম্মতিতে। তাকে ক্যামেরুনের কোর্টে গিয়ে নিজে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, সে জমি হস্তান্তর করছে'।

'ঠিক বলেছেন'।

'অথচ জীবন দিতে হলেও ওমর বায়া জমি হস্তান্তরে সম্মত হবে না, একথা এ কয়েকদিন পরিষ্কার বুঝা গেছে'।

'কিন্তু পথ একটা বের করতেই হবে?'

'সে কথাই ভাবছি'। কথাটা বলা শেষ করেই পিয়েরে পল সোজা হয়ে বসল। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। খুশীতে চকচকে দেখাল তার চোখ দু'টোকে। যেন হঠাৎ বড় কিছু পেয়ে গেছে সে।

বলল, 'মিঃ ফ্রান্সিস বাইক, পেয়ে গেছি'।

'কি বলেন?' খুশী হয়ে বলল ফাদার ফ্রান্সিস বাইক।

'পেয়েছি সন্ধান এক অব্যর্থ অস্ত্রের'।

'কি সেই অস্ত্র?'

'বলব না, দেখাব'। বলে উঠে দাঁড়াল পিয়েরে পল।

তার সাথে সাথে ফ্রান্সিস বাইকও।

দরজা খোলার শব্দে চোখ খুলল ওমর বায়া।

দরজা খোলার সাথে সাথে আলো জ্বলে উঠল ঘরে। ঘরের আলোর সুইচটি সম্ভবঃত কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল বোর্ডে। ওরাই ইচ্ছমত আলো জ্বালায় এবং নিভায়।

ওমর বায়ার ঘরটি ছোট্ট একটা সেল। ছাদ বিরাট উঁচুতে। উঁচু ছাদটির গায়ে লুকানো বৈদ্যুতিক বাল্ব থেকে আলো আসছে ঘরে। ঘরে একটা খাটিয়া এবং পানির একটা প্লাষ্টিকের জাগ ছাড়া আর কিছু নেই। খাটিয়াটা প্লাষ্টিকের, মেঝের সাথে এটে দেয়া।

ঘরের সাথে এটাস্ট একটা টয়লেট। অটোমেটিক ফ্লাস সিস্টেমের টয়লেট টিস্যু পেপার ছাড়া আর কিছুই নেই।

অর্থাৎ ঘরে এমন কিছু রাখা হয়নি যা দিয়ে আক্রমণাত্মক কোন কাজ বা মুক্তির কোন চেষ্টা ওমর বায়া করতে পারে।

দরজা খুলে গেলে ওমর বায়া শোয়া থেকে উঠে বসল। সে লক্ষ্য করল, আজ শোয়া থেকে উঠতে আর ব্যথা লাগল না গায়ে। ঘাগুলো সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। কিন্তু দেহের দুর্বলতা যায়নি। এ দুর্বলতার একটা বড় কারণ হলো, ওমর বায়া অনশন করেছিল শুকরের গোশত এবং শুকরের চর্বি দেয়া খাবারের বিরুদ্ধে। ব্ল্যাক ক্রস কর্তৃপক্ষ প্রথম দিকে খাবারের মেনু পাল্টাতে রাজী হয় নি। কিন্তু ওমর বায়া তিনদিন অনশনের পর তারা নতি স্বীকার করেছে। শুকরের গোশত ও শুকরের চর্বিযুক্ত খাবার সরবরাহ বন্ধ করা সহ হালাল খাদ্য সরবরাহ করার পর ওমর বায়া অনশন ভেঙেছে।

খাবার নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল ডুপ্লে। কয়েকদিন পর ডুপ্লেকে দেখে বিস্মিত হলো ওমর বায়া।

ডুপ্লেই শুরু থেকে ওমর বায়ার ঘরে খাবার সরবরাহ করে। কিন্তু ওমর বায়া অনশন করার সময় থেকে সে বেশ কয়দিন ছিল না। ডুপ্লে বেশী কথা বলে। ওমর বায়া তাকে পছন্দ করে। তার তুলনায় অন্যেরা যন্ত্রের মত। যন্ত্রের মত নীরবে খাবার দিয়ে যায় এবং পরে থালাবাসন নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসা না করলে একটা কথাও বলে না।

ডুপ্লে ঘরে ঢোকার পর ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ডুপ্লে খাবারের বাক্স নিয়ে এগুলো ওমর বায়ার দিকে।

এগুতে এগুতে বলল, তুমি জিতে গেছ হিদেন।

ডুপ্লে ওমর বায়ার অনশনের দিকে ইংগিত করল।

‘জয় কোথায়, মৃত্যু থেকে রক্ষা। তুমি যে ক’দিন ছিলে না?’

ডুপ্লের মুখটা কালো হয়ে উঠল। খাবার বাক্সটা ওমর বায়ার খাটিয়ার উপর রাখতে বলল, ‘আমার মায়ের অসুস্থতার খবর শুনে বাড়ি গিয়েছিলাম’।

‘তারপর?’ উদগ্রীব কন্ঠে বলল ওমর বায়া।

‘আমার মাকে দেখতে পাইনি যাওয়ার আগেই....’।

কথা শেষ করতে পারলো না ডুপ্লে। কান্নায় জড়িয়ে গেল তার কথা।

ওমর বায়া সান্ত্বনার সুরে বলল, দুঃখ করো না ডুপ্লে। তোমার চেয়েও বড় দুর্ভাগা আমি। আমি আমাকে বাঁচাতে গিয়ে আম্মাকে বাঁচাতে পারিনি। হত্যা করেছে ওরা আমার আম্মাকে’।

‘কারা হত্যা করেছে তোমার মাকে?’

‘ওকুয়া’। যাদের পক্ষে তোমরা কাজ করছ’।

ডুপ্লে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওমর বায়ার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর খাবার বাক্স ফেরত নিতে এল।

খাবার বাক্স গুছিয়ে নিচ্ছিল ডুপ্লে। তার চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ। চোখে নরম দৃষ্টি। একবার ওমর বায়ার দিকে চকিতে তাকিয়ে মুখ নিচু করে নিচু স্বরে বলল, ‘তুমি যদি কাউকে কোন কথা পৌঁছাতে চাও, তাহলে লিখে রেখ ঠিকানা সমেত’।

বলেই ডুপ্লে খাবার বাক্স নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সে উঠে দাঁড়াবার সাথে সাথে তার কোল থেকে একটা দামী সিগারেটের প্যাকেট পড়ে গেল। ডুপ্লে উঠেই ঘুরে দাড়িয়ে দরজার দিকে চলল।

‘ডুপ্লে তুমি সিগারেট ফেলে গেলে’।

কিন্তু ডুপ্লে ওমর বায়ার কথা যেন শুনতেই পেল না এইভাবে বেরিয়ে গেল।

ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল ওমর বায়া সিগারেটের প্যাকেট হাতে তুলে নিল। অত্যন্ত দামী সিগারেটের প্যাকেট। খুব হালকা মনে হলো। অর্থাৎ সিগারেট

নেই বা দু'একটা আছে। ওমর বায়া খুলল সিগারেটের প্যাকেট। খুলে বিস্মিত হলো ওমর বায়া, সিগারেটের একটা শলাও নেই, আছে ছোট্ট একটা পেন্সিল।

পেন্সিল দেখার সাথে সাথে ডুপ্লের শেষ কথাটা মনে পড়ল, কোথাও কোন কথা যদি পৌছাতে চাই তাহলে ঠিকানা সমেত যেন লিখে রাখি।

শিউরে উঠল ওমর বায়া। ব্ল্যাক ক্রসের ডুপ্লে তার পক্ষে এই কাজ করবে!

কিন্তু ওমর বায়া লিখবে কিসে? পরক্ষনেই খুশী হয়ে উঠল ওমর বায়া। প্যাকেটের ভেতরের সিগারেটের মোড়ক কাগজটিতে যথেষ্ট বড় একটা চিঠি সে লিখতে পারে।

ওমর বায়া প্রশংসা করল ডুপ্লের বুদ্ধির।

খুশি হয়ে ওমর বায়া তখনই প্যাকেটের ভেতর থেকে মোড়ক কাগজটি বের করে ফিলিস্তিন দুতাবাসের নামে একটা চিঠি লিখে ফেলল। দুতাবাসের ঠিকানাও লিখল। লিখার পর কাগজটি পেন্সিল সমেত আবার প্যাকেটে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর প্যাকেটটিকে খাটিয়া ও দেয়ালের ফাঁক দিয়ে নিচে ফেলে দিল। ডুপ্লে এলে ওখান থেকে তুলে নেবে।

মনটা একটু হাল্কা হলো ওমর বায়ার। ওমর বায়া কোথায় ও কার হাতে বন্দী আছে এটা যদি ফিলিস্তিন দুতাবাস জানতে পারে, তাহলে তারা সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারবে এবং জানাতে পারবে আহমদ মুসাকেও।

মেঝেয় কিছুক্ষণ পায়চারী করল ওমর বায়া। হাত ও পা শিকল দিয়ে বাঁধা। এক ফুটের বেশী হাত-পা ফাঁক করা যায় না। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ হাঁটাহাটি করে ওমর বায়া এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কিন্তু খাটিয়ায় শুয়ে তামাকে অনভ্যস্ত ওমর বায়া তামাকের গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। বুঝল ঠিক মাথার কাছাকাছি খাটিয়ার নিচের সিগারেটের প্যাকেট থেকে এই গন্ধ আসছে।

ওমর বায়া খাটিয়ার নিচে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটাকে খাটিয়ার পেছন দিকে ছুড়ে দিল। এতে গন্ধের তীব্রতা একটু কমল।

ঘুমিয়ে পড়েছিল ওমর বায়া।

দরজা খোলার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল তার।

চোখ খুলে দেখল, ঘরে প্রবেশ করছে মশিয়ে লিলি, ব্ল্যাক ক্রস প্রধান পিয়েরে পলের দক্ষিণ হস্ত। লোকটির সাপের মত ঠান্ডা কথা এবং তাপমাত্রায় ভদ্র ব্যবহার দেখে ওমর বায়া বুঝেছে লোকটা ভীষণ বুদ্ধিমান। ওয়াটের ঠিক বিপরীত। ওয়াট চাবুক দিয়ে কথা বের করতে চায়, আর এ সুন্দর কথার পরশ বুলিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়।

মশিয়ে লালি দু'একদিন পরপরই আসে। এসে বার বার একই কথা বলে, ওমর বায়ার জমি হস্তান্তর সমস্যাকে এতদুর আনা ঠিক হয়নি ওকুয়া'র। ভালো ব্যবহার করলে উপযুক্ত দামে ওমর বায়া জমি অবশ্যই দিয়ে দিত। সবাই যখন কাম্পু উপত্যকা থেকে চলে গেছে, তখন সে একা থেকে আর লাভ কি! যাই হোক, বিষয়টা নিয়ে আবেগমুক্ত মন নিয়ে ওমর বায়ার ভাবা দরকার। দশ হাজার একর জমির জন্যে জীবন দেয়ার কোন মানে হয় না। ব্ল্যাক ক্রস ওকুয়া'কে কথা দিয়ে বিপদে পড়েছে। এ বিপদ থেকে ওমর বায়া ব্ল্যাক ক্রসকে উদ্ধার করলে ব্ল্যাক ক্রস ওমর বায়াকে অন্যান্য সাহায্য যা সে চায় দিতে রাজী আছে। ইত্যাদি...।

ওমর বায়া বিছানায় উঠে বসল। ভাবল, ঘন্টা খানেক সময় এখন তাকে ঐ একই বকবকানি শুনতে হবে।

ঘরে ঢুকে ওমর বায়ার দিকে নজর ফেলেই বলে উঠল মশিয়ে লালি, বাঃ তোমার স্বাস্থ্য তো বেশ ইমপ্রুভ করেছে। তিন দিন আগে এসেছিলাম, সেদিনের চেয়ে আজ তুমি অনেক ভাল। মনও ভাল আছে নিশ্চয়।

কিন্তু দরজা থেকে ওমর বায়ার দিকে কয়েক ধাপ এগুতেই মশিয়ে লালির চোখটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। দু'একবার নাক টেনে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, তোমার ঘরে ভি.আই.পি কেউ আজ এসেছিল?

'না, কেন?'

'ইম্পিয়াল সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছি। কেউ খেয়েছে এখানে, তোমাকে কেউ কি দিয়েছে?'

'আমি তো সিগারেট খাই না'।

'তুমি ঠিক বলছ না'।

বলে মশিয়ে লালি এগিয়ে এসে বিছানার কম্বল, বালিশ, ইত্যাদি উঠিয়ে দেখতে লাগল। কিছুই পেল না। এরপর সে বসে খাটের তলায় উকি দিল। দেখতে পেল সে সিগারেটের প্যাকেট। মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। বলল, 'ভেবেছিলাম তুমি খাটিঁ মুসলমান, নিশ্চয় মিথ্যা কথা বল না। কিন্তু ধরা পড়ে গেলে। সিগারেট খেতে শুরু করেছ। পেলে কোথায় সিগারেট? আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নিশ্চয় কোথায় ফাঁক আছে'।

এসব কথা বলতে বলতে খাটিয়ার তলা থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে আনল মশিয়ে লালি।

উঠে দাঁড়াল সে।

খুলল সে সিগারেটের প্যাকেট।

ওমর বায়ার মুখটা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল।

সিগারেটের প্যাকেট খুলে চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল মশিয়ে লালির।

সিগারেটের প্যাকেট থেকে সে ছোট্ট পেন্সিলটা বের করে হাতে নিল। তারপর মোড়ক কাগজটি বের করে মেলে ধরল চোখের সামনে।

মিনিট খানেক পর সে ধীরে ধীরে চোখ তুলল ওমর বায়ার দিকে। তার সেই সাপের মত ঠান্ডা চোখ।

ওমর বায়ার ভয় তখন কেটে গিয়েছিল। তার চোখে তখন বেপরোয়া ভাবের একটা স্ফুলিংগ।

'ওমর বায়া, সিগারেটের এই প্যাকেট এবং এই পেন্সিল তোমাকে কে এনে দিয়েছে?' ঠান্ডা অথচ অত্যন্ত শক্ত কন্ঠে জিজ্ঞাসা করল মশিয়ে লালি।

ওমর বায়া তার চোখ নিচু করল। কথা বলল না।

'তোমাকে কথা বলতে হবে ওমর বায়া। তোমার চিঠি আমাদের কাছে দোষণীয় নয়, তুমি সুযোগ পেলে এটা করতেই পার। কিন্তু আমরা জানতে চাই কোন শয়তান তোমাকে সাহায্য করেছে'। চিবিয়ে চিবিয়ে অত্যন্ত কঠোর কন্ঠে বলল মশিয়ে লালি।

কোন উত্তর দিল না ওমর বায়া।

চোখ দু'টি জ্বলে উঠল মশিয়ে লালির। বারুদের ঘরে যেন আগুন লাগল।

ওমর বায়া শেকল বাঁধা দু'টি পা মেঝেতে রেখে খাটিয়ার উপর বসেছিল। মশিয়ে লালি ছুটে এসে জুতার গোড়ালী দিয়ে ওমর বায়ার ডান পায়ের আঙুলের উপর প্রচন্ডভাবে আঘাত করল। চিৎকার করে উঠে মেঝের উপর বসে পড়ল ওমর বায়া। পায়ের আঙুলগুলো একদম থেতলে গেছে তার। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে থেতলানো জায়গা দিয়ে।

'দাড়াও তোমাকে কথা বলতে হবে'। বলে মশিয়ে লালি মুখ দরজার দিকে ফিরিয়ে হাততালি দিল। দু'জন প্রহরী প্রবেশ করল ভেতরে।

'তোমরা ওয়াটকে আসতে বল। আর বল, গত পরশু থেকে এ ঘরে যারাই এসেছে তাদের এখানে হাজির করতে'। গর্জে উঠল মশিয়ে লালির কন্ঠ।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সবাই এসে হাজির হলো ঘরে।

গত পরশু থেকে ওমর বায়া ঘরে খাদ্য পরিবেশনকারী তিনজন, চারজন প্রহরী, একজন ডাক্তার এবং টয়লেটের জন্যে একজন ফিটার প্রবেশ করেছে। সবাইকে হাজির করা হয়েছে মশিয়ে লালির সামনে।

সবার মুখই ভয়ে ফ্যাকাসে। ব্ল্যাক ক্রসের সাথে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করলে শাস্তি একটাই- মৃত্যুদন্ড। সকলেরই বুক দুরু দুরু করছে। ওমর বায়া সত্য-মিথ্যা যার নামই বলুক, তার আর রক্ষা নেই। সবাই ভয়ে ভয়ে চোরা চোখে তাকাচ্ছে ওমর বায়ার দিকে। ডুপ্লের অবস্থায় সবচেয়ে বেশী খারপ। তার চোখের সামনে মৃত্যু এসে নাচছে। বাড়িতে স্ত্রী ও মেয়ে আছে। তাদের ছবি এসে ভাসছে তার চোখে। সে মশিয়ে লালির চোখ এড়িয়ে ঘন ঘন তাকাচ্ছে ওমর বায়ার দিকে। কিন্তু ওমর বায়ার চোখ কারও দিকে নেই। সে মুখ নিচু করে পাথরের মত বসে আছে।

'শোন ওমর বায়া, সবাইকে হাজির করেছি। এই আটজনের কেউ একজন তোমাকে সিগারেটের প্যাকেট সরবরাহ করেছে। দেখিয়ে দাও কে সেই কুত্তা'। শান্ত কিন্তু অত্যন্ত কঠোর কণ্ঠে বলল মশিয়ে লালি।

মুখ তুলল ওমর বায়া। তার শান্ত চোখ, ঠোটে এক টুকরো হাসি। বলল, 'এত আয়োজন বৃথাই করেছেন মিঃ মশিয়ে লালি। সিগারেটের প্যাকেট কেউ আমাকে দেয়নি। আমি মেঝেতে কুড়িয়ে পেয়েছি'।

‘মিথ্যা কথা। পেন্সিল কোথায় পেলে তুমি’।

‘পেন্সিলও ঐভাবেই পেয়েছি’।

‘শয়তানের বাচ্চা তুমি। কথা তোমাকে বলতে হবে। ওয়াট তোমার কাজ শুরু কর’।

ওয়াট এক গাল হেসে এগিয়ে এল ওমর বায়ার দিকে। হাতে তার বিখ্যাত অপারেশন বাক্স।

‘তোমাকে যখন বাচিয়েঁ রাখা আমাদের দায়িত্ব, তখন তোমার গা আর পচাব না’। বলতে বলতে ওয়াট ওমর বায়ার হাত বিশেষ ভাবে তৈরী কাঠের জালির মধ্যে ঢুকিয়ে হাত সমেত ওটাকে খাটিয়ার সাথে বেঁধে ফেলল। বলল, ‘ওমর বায়া আজ বড় কিছু নয়, কথা বলানোর ক, খ পদ্ধতি প্রয়োগ করব’।

বলে ক্রুব হেসে ওয়াট তার বাক্স থেকে লম্বা সুচ বের করে আনল। বলল, ‘বাম হাত থেকেই শুরু করা যাক’।

বলে ক্রুর হেসে ওয়াট তার বাক্স থেকে লম্বা সুচ বের করে আনল। বলল, ‘বাম হাত থেকেই শুরু করা যাক’।

ওমর বায়ার হাত তো দূরে আঙুলগুলোও নড়াবার কোন উপায় ছিল না।

ওয়াট ওমর বায়ার বাম হাতের মধ্যমাটি বাম হাতে শক্ত করে ধরে ডান হাত দিয়ে নখের নিচ দিয়ে সুচ ঢুকিয়ে দিল।

ওমর বায়া চোখ বন্ধ করে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে চুপ থাকার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারল না। আর্তনাদ করে উঠল। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল তার মুখ।

ডুপ্লে এবং ডেকে আনা অন্যান্যরা ভয়ে চোখ বুজেছিল। তাদের কারও মুখে রক্ত ছিল না।

মশিয়ে লালি বলল, ‘আমরা তোমার উপর এই অত্যাচার করতে চাইনি তুমি আমাদের বাধ্য করেছ। এখনও নাম বল সেই শয়তারটার, যে তোমাকে ওগুলো সরবরাহ করেছিল’।

ওমর বায়া যন্ত্রণায় ধুকছিল। কোন উত্তর দিল না।

‘এ শয়তানের শয়তান মশিয়ে’। বলে ওয়াট আরেকটা সুচ ওমর বায়ার তর্জনিতে ঢুকিয়ে দিল।

আবার সেই বুক ফাটা চিৎকার করে উঠল ওমর বায়া। দেহ তার কাঁপছে যন্ত্রণায়। হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছে বাঁধন থেকে। কিন্তু বাঁধন চুল পরিমাণ ঢিলাও হচ্ছে না।

ওয়াট ওমর বায়ার যন্ত্রণা কাতর মুখে একটা ঘুষি চালিয়ে বলল, 'কথা বল শয়তানের বাচ্চা শয়তান'।

নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল ওমর বায়ার। চোখ খুলল সে। বলল, তোমরা আমাকে মেরে ফেল, কিন্তু যা বলেছি তার বাইরে আমার কোন কথা নেই'।

'ওরে নেড়ি কুত্তা' বলে ওয়াট এবার সুচ ঢুকিয়ে দিল বাম হাতের বুড়ো আঙুলে। আবার ওমর বায়ার সেই বুক ফাটা আর্তনাদ। প্রচন্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল সে। হাতটা খুলে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু কোন ফল হলো না। নাইলনের সরু দড়ি বরং কেটে বসল তার হাতে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। আঙুলের রক্তের সাথে সে রক্ত একাকার হয়ে গেল।

ডুপ্লেরা আটজন ভয়ে আঁৎকে গুটিয়ে গিয়েছিল। ওমর বায়া দিশেহারা হয়ে কার নাম করে বসে, এই তাদের বড় ভয়। তাদের প্রতি মুহুর্তেই মনে হচ্ছে এই বুঝি নাম করে বসে। কেউ কেউ ভাবছে, ওমর বায়ার পর নির্যাতন তাদের উপর শুরু হবে কি? ডুপ্লের মনে তখন প্রবল ঝড়। তার মনে এখন ভয়ের চেয়ে অপরাধ বোধই বেশী। সে ভাবছে, তার কারণেই বেচারা ওমর বায়ার এই দুর্দশা। অযাচিত ভাবেই সে তাকে চিঠি দেয়ার কথা বলেছে এবং পেন্সিল ও সিগারেটের প্যাকেট সরবরাহ করেছে।

ওমর বায়া আবার হৃদয় বিদারক চিৎকার দিয়ে উঠল। চমকে উঠে চোখ তুলল ডুপ্লে ওমর বায়ার দিকে। আরেকটা সুচ ঢুকানো হয়েছে ওমর বায়ার অনামিকায়। যন্ত্রণায় বিকৃত ওমর বায়ার মুখ। তার চোখ দু'টি বোজা। মুখে কোন কথা নেই। মশিয়ে লালি ও ওয়াটের হুমকি-ধমকি নির্যাতন তার মুখ খুলতে পারছে না। ডুপ্লের সমগ্র অন্তর ওমর বায়ার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিতে নুয়ে পড়ল।

'তোকে কথা বলতেই হবে শয়তান। ব্ল্যাক ক্রস পরাজয় মানে না। তোর হাত-পায়ের সব আঙুল শেষ করব। তারপর চামড়া কাটব। কথা বলতে হবে

তোকে'। চিৎকার করে বলল ওয়াট। তারপর টেনে নিল ওমর বায়ার অন্য একটা আঙুল।

চলল এই নির্যাতন।

ক্লান্ত দেহ নেতিয়ে পড়েছে ওমর বায়ার। চিৎকার শক্তিও কমে যাচ্ছে তার। মেঝের অনেকখানি জায়গা ওমর বায়ার লাল রক্তে ভাসছে।

হাত শেষ করে যখন ওয়াট ওমর বায়ার পায়ের দিকে এগুচ্ছে, এই সময় ঘরে দ্রুত প্রবেশ করল পিয়েরে পল ব্ল্যাক ক্রসের প্রধান। বলল, 'থাম ওয়াট'।

সুচ সমেত হাত সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল ওয়াট। মশিয়ে লালি বলল, 'শুনেছেন সব কিছু?'

'হ্যাঁ শুনেছি লালি। এভাবে তাকে কথা বলানো যাবে না। তাকে নিয়ে অন্য কিছু ভাবছি'। তারপর ওয়াটের দিকে ফিরে বলল, ওকে ছেড়ে দাও ওয়াট। ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। তুমি এস লালি। এদের যেতে বল'।

বলে ফিরে দাড়িয়েঁ দরজার দিকে হাঁটা শুরু করল পিয়েরে পল। মশিয়ে লালিও বেরিয়ে এল পিয়েরে পলের সাথে সাথে।

'নতুন কি ভাবছ শয়তানটাকে নিয়ে?' বলল মশিয়ে লালি।

'দৈহিক শাস্তি দিয়ে ওর কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় নি তুমি ফুসলিয়েও দেখেছ, কোন লাভ হয় নি'।

'তাহলে উপায় কি?'

'উপায় আছে। ওর মাথাটা আমাদের দখল করতে হবে'।

'মাথা? কিভাবে?

'সবই জানবে, মানুষ যদি চাঁদ জয় করতে পারে, তাহলে মানুষের মাথা দখল করতে পারবে না কেন?'

'কোন সাইকিয়াট্রিক পদ্ধতি কি?

'তার চেয়েও উন্নত ও নিরাপদ। সেটা কম্পিউটার পরিচালিত ইলেকট্রোয়েনস ফিলোগ্রাম ও ইলেকট্রমিওগ্রাম'।

'ওতো সাংঘাতিক জটিল ব্যাপার। মানুষের ক্ষেত্রেও ওটা কাজ করে?'

'তাই শুনেছি। কিন্তু কয়েকজন বিজ্ঞানীই এটা পারেন। তাদের সন্ধান করছি। যাক একথা। শোন, আজকেই ওমর বায়াকে এখান থেকে সরিয়ে নাও আমাদের এক নম্বর ঘাটিতে। আর যে আটজনকে সন্দেহ করছ, তাদের এই মুহুর্তে কিছু বলার দরকার নেই। আটজনের বাইরেও এটা কেউ করতে পারে। ওমর বায়াকে ইচ্ছানুসারে কথা বলাতে পারলেই সব জানা যাবে'।

'কিন্তু এটা এখনও তো সম্ভাবনার ব্যাপার'।

'তা বটে। কিন্তু বিজ্ঞানীকে পাওয়া যাবে'।

কথা বলতে বলতে দু'জন পিয়েরে পল-এর অফিসে এসে প্রবেশ করল।

বিশাল অফিস। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীর কক্ষও এত বড় নয়। তা হবে, কারণ ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী শুধুই ফ্রান্সের। কিন্তু পিয়েরে পল গোটা দুনিয়া জোড়া সংগঠনের নেতা। ব্ল্যাক ক্রস-এর হাত দুনিয়ার সব জায়গায়। যেখানেই খৃষ্টান এনজিও কিংবা মিশনারীরা বাধার সম্মুখীন হয় এবং পেছন দরজা দিয়ে সাহায্যের তাদের প্রয়োজন হয়, সেখানেই গিয়ে হাজির হয় ব্ল্যাক ক্রস। 'ব্ল্যাক ক্রস' নামকরণ এই কারণেই যে এ সব সময় পর্দার আড়ালে অর্থাৎ অন্ধকারে থেকেই কাজ করে। বিশাল এর নেটওয়ার্ক, বিরাট এর শক্তি এবং বিপুল এর সম্পদ। বসনিয়ার যুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সার্বীয়দের অস্ত্রের কোন অভাব হয়নি এদের কারণেই। এরা কালো বাজারে পিস্তল থেকে ট্যাংক পর্যন্ত যোগান দিতে পারে। খৃষ্টান সরকারগুলোর উপর এদের বিরাট প্রভাব। কোন সরকারের কোন বেয়াড়া সিদ্ধান্তকে অনুরোধে না হলে হুমকি দিয়েও বাগে আনতে পারে এরা। এদের ভরসাতেই বসনিয়ার সার্বীয়রা লন্ডন, প্যারিসে বোমা ফাটানোর হুমকি দিতে পেরেছিল। এ হুমকিতে কাজও হয়েছিল। ইউরোপীয় দেশগুলো কোন সময়ই মজলুম বসনীয় মুসলমানদের জন্যে কার্যকর কিছু করতে পারে নি কিছুটা এদের ভয়েই।

পিয়েরে পল তার চেয়ারে বসেই টেলিফোনটা টেনে নিল। বলল, বিজ্ঞানীকে পাওয়ার ব্যাপারে কতদুর এগুতে পারল দেখি।

দক্ষিণ প্যারিসের আবাসিক এলাকায় ১০ তলার একটা ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটটি ডুপ্লের।

ডুপ্লে শুয়ে আছে তার বেডরুমে। চোখ বুজে শুয়ে আছে সে। বাম হাতটি তার কপালের উপর ন্যস্ত।

মুখের ফ্যাকাসে ভাব এখনও তার কাটেনি।

একটি তরুণী ঘরে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে ডুপ্লের পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, আব্বু শরীর খারাপ করেছে?

তরুনীটি ডুপ্লের মেয়ে রোসা। ডুপ্লের মেয়ে এবং স্ত্রী দু'জনেই বিস্মিত হয়েছিল ডুপ্লেকে অসময়ে অফিস থেকে এসে শুয়ে পড়তে দেখে। এ সময় ডুপ্লে অফিস থেকে কখনই ফিরে না, তার উপর এসে শুয়ে পড়েছে।

'না মা শরীল খারাপ করেনি'। কপাল থেকে হাতটা নামিয়ে বলল ডুপ্লে।

'না, আব্বু এভাবে এসে তোমার শুয়ে পড়া...' কথা শেষ করল না রোসা।

এ সময় ঘরে এসে প্রবেশ করল রোসা'র মা ডুপ্লের স্ত্রী। বলল, 'কি তোমার শরীর খারাপ করেনিতো ডুপ্লে?'

'না শরীর খারাপ নয়, মনটা খুব খারাপ লেটি'। ডুপ্লের স্ত্রীর নাম লেটিছিয়া।

'কেন? কিছু ঘটেছে?'

'সাংঘাতিক একটা ঘটনা ঘটেছে লেটি'।

'কি ঘটেছে?' উদ্বেগে চোখ বড় বড় করে বলল লেটিছিয়া।

উদ্বিগ্ন রোসা তার আব্বার মাথার কাছে মেঝেতে বসল।

'একটা নিগ্রো বন্দীর কথা তোমাদের বলেছিলাম না? তাকে নিয়ে বড় ঘটনা ঘটেছে'।

'কি ঘটনা?' জিজ্ঞাসা করল ডুপ্লের স্ত্রী।

ওমর বায়ার কাগজ ও পেন্সিল পাওয়া, তার চিঠি লেখা, ধরা পড়া তার উপর অমানুষিক নির্যাতন, তবুও সরবরাহকারীর নাম না বলা সব ঘটনা বলল ডুপ্লে।

উদ্বিগ্ন ভাবে শুনলো কথাগুলো মা ও মেয়ে। ডুপ্লে কথা শেষ করলেও কিছুক্ষণ কথা বলল না ওরা দু'জন। পরে তরুণী রোসা বলল, 'আমাদের এক ম্যাডামের কাছে গল্প শুনেছি, মিথ্যা না বলা ও ওয়াদা রক্ষা করা মুসলমানদের ধর্ম। তোমার এ নিগ্রো বন্দী তো মুসলমান'।

'ঠিক বলেছ মা। লোকটির সততা আমাকে অভিভূত করেছে। আমরা কেউ হলে নাম বলে দিতাম। সত্য না বললেও মিথ্যা-মিথ্যি কারো নাম বলে ভয়ানক নির্যাতন থেকে বাঁচার চেষ্টা করতাম। শত্রু বিশেষ করে ব্ল্যাক ক্রস- এর সবাই প্রকৃত পক্ষে শত্রু। সুতরাং তাদের কারও উপর দোষ চাপিয়ে বাঁচার পথ খুজতাম'।

'শুধু ঐ নির্যাতন দেখেই কি তুমি এতটা মুষড়ে পড়েছ?' বলল ডুপ্লের স্ত্রী লেটি।

'ওর ঐ নির্যাতনের জন্যে আমি দায়ী লেটি'।

'কেমন করে?'

'আমিই ওকে চিঠি লেখার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, আমিই ওকে পেন্সিল ও সিগারেটের প্যাকেটে কাগজ দিয়েছিলাম'।

'তুমি?' আতংকে চোখ দু'টি বিস্ফোরিত হয়ে উঠল লেটিছিয়ার। তরুণী রোসারও মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল।

লেটিছিয়া খাটের এক পাশে বসতে বসতে বলল, 'তুমি ব্ল্যাক ক্রসকে চেন না? নিগ্রো লোকটা যদি মুখ খুলতো তাহলে তো এতক্ষণে কিয়ামত হয়ে যেত'।

'হঠাৎ করেই লোকটার প্রতি মমতা এসে গিয়েছিল। লোকটা একদম বিনা অপরাধে নির্যাতন ভোগ করছে'।

'লোকটার উপর যদি আবারও নির্যাতন হয়, বলে দেয় যদি লোকটা তোমার নাম?' রোসার মুখ থেকে ভয়ের ছাপ এখনও যায়নি।

‘জানি না কি হবে। তবে মনে হয় লোকটাকে নির্যাতন নয়, অন্য কোনভাবে হাত করার চেষ্টা করবে’।

‘লোকটা চিঠিতে কি বলতে চেয়েছিল, তাও জান না?’

‘জানি না। একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?’

লেটিছিয়া কিছু বলার আগেই রোসা বলল, ‘আব্বু লোকটা তোমার নাম বলে দিতে পারে বলে মনে কর?’ রোসার কন্ঠস্বর ভারি।

ডুপ্লে মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে কপালে একটা চুমু খেয়ে বলল, চিন্তা করো না মা। ওমর বায়া মুসলমান না হয়ে অন্য জাতির লোক হলে আমি ভয় করতাম। কিন্তু মুসলমান ওমর বায়ার কাছ থেকে এ ভয় নেই। জান, মুসলমানরা সত্যিকার মুসলমান হলে লোহার চেয়ে শক্ত হয়, পাহাড়ের চেয়ে ওজনদার হয়, আকাশের চেয়ে উঁচু হয় এবং স্বর্ণের চেয়ে সুন্দর হয়। ওদের থেকে কোন ভয় নেই মা’।

‘ওমর বায়া কি সত্যিকার মুসলমান?’ বলল রোসা।

‘আমার তাই মনে হয়। হাত-পা শিকল বাঁধা অবস্থাতেও সে নামায পড়ে। ইসলাম ধর্মে শুকর খাওয়া এবং আল্লাহর নাম নিয়ে জবেহ নয় এমন গোশত খাওয়াও নিষেধ। ওমর বায়া ক’দিন না খেয়ে থেকেছে তবু এসব জিনিস খেতে রাজী হয়নি’।

‘লোকটাকে আমরা কোন সাহায্য করতে পারি না?’ ফিস ফিস কন্ঠে বলল লেটিছিয়া।

‘সাহায্য করতে তো চেষ্টা করেছিলাম’।

‘এখন কিছু করার নেই? দেখ, তাকে সাহায্য করলে আমাদের দু’টো লাভ। একটা ভালো মানুষের উপকার হলো এবং আমরা তোমার নাম প্রকাশ হওয়ার ভয় থেকে বাঁচলাম’।

একটু ভাবল ডুপ্লে। বলল, ‘পেয়েছি। তাকে কিডন্যাপ করার আগে সে ফিলিস্তিন দুতাবাসে ছিল। সুতরাং ফিলিস্তিন দুতাবাস অবশ্যই তাকে চেনে’। আনন্দে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডুপ্লের।

‘ঠিক। তুমি একটা চিঠি লিখে ওমর বায়ার কথা ওদের জানিয়ে দাও’। বলল লেটি।

‘গিয়ে সব বললে ভালো হয় না’।

‘তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, ব্ল্যাক ক্রস নিশ্চয় দুতাবাসের উপর চোখ রাখছে। খবরদার ওমুখো হবে না’।

ডুপ্লে স্তম্ভিত ভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, ‘তোমার এত দুরদৃষ্টি লেটি। এ সহজ কথাটা ঘুর্নাক্ষরেও আমার মনে আসেনি। ধন্যবাদ তোমাকে’।

‘ধন্যবাদ দরকার নেই। তুমি ব্ল্যাক ক্রস- এর একজন। তুমি আগুনের মধ্যে দাড়িয়েঁ। তোমাকে আরও সাবধান হতে হবে’। বলল লেটি।

ডুপ্লের স্ত্রী লেটি থামতেই মেয়ে রোসা বলে উঠল, ‘ব্ল্যাক ক্রস তুমি ছেড়ে দাও আব্বু’।

ডুপ্লের মুখটি ম্লান হয়ে উঠল। বলল, ‘ব্ল্যাক ক্রসে ঢোকার পথ আছে মা বের হবার কোন পথ নেই’।

‘কিন্তু তুমি এক সময় বলেছিলে এটা একটা মহান সংগঠন। যারা নির্দোষ মানুষের রক্তপাত করে, হিংসাই যাদের মুলধন, তারা আবার কিসের মহান সংগঠন?’ ক্ষোভে ফুসে উঠল ডুপ্লের স্ত্রী।

‘সংগঠনের কি দোষ? আমাদের খৃষ্টান ধর্মের স্বার্থেই তো এ সংগঠনের সৃষ্টি’। বলল ডুপ্লে।

‘দেখ ব্ল্যাক ক্রস নামটাই খারাপ। ক্রস ব্ল্যাক হবে কেন? ব্ল্যাক তো শয়তানের প্রতীক’। বলল লেটি।

‘এ ব্ল্যাক সে ব্ল্যাক নয়। এ ব্ল্যাক অর্থ ‘গুপ্ত’-‘আন্ডার গ্রাউন্ড’।

‘কিন্তু একটা ন্যায়নিষ্ঠ দল কেন আন্ডার গ্রাউন্ড হবে? তোমরা কি শত্রু দেশে না শত্রু পরিবেশে কাজ করছ?’

‘না তা নয়। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের এমন অনেক কাজ এসে পড়ে যা প্রকাশ্যে করা যায় না’।

‘থাকতে পারে। কিন্তু ব্ল্যাক ক্রস খৃষ্টান স্বার্থের প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার যে নীতি গ্রহণ করেছে সেটা কি জাতীয় স্বার্থ? ওমর বায়াকে তোমরা যে নির্যাতন করছ, পৃথিবীর কোন আইনে তা বৈধ?’

‘লেটি, অতীতে ব্যাপারটা এমন ছিল না। নানা প্রয়োজন ও বিবেচনা থেকে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে’।

দেখ, খুঁজলে অজুহাত, যুক্তি সব কাজের পক্ষেই পাওয়া যাবে। যাক, এসব কথা। রোসা যা বলেছে, আমারও সেটাই কথা। সরাসরি সরে আসতে পারবে না। ধীরে ধীরে নিস্ক্রিয় হয়ে পড়। ওদের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়লে বেরিয়ে আসার একটা পথ হয়ে যাবে’। বলল লেটি।

লেটিছিয়ার কথা শেষ হলেও ডুপ্লে কিছুক্ষণ কথা বলল না। পরে ধীরে ধীরে বলল, শারীরিক ও পারিবারিক বিভিন্ন কারণে আমি এক মাসের ছুটি চেয়েছিলাম। মঞ্জুরও হয়েছে। কিন্তু অফিসের এ গন্ডগোলের কারণে দু’একদিন অপেক্ষা করে তারপর ছুটিতে যেতে চাচ্ছি, ‘তোমরা যা বললে ছুটির এ সময়ে আরও চিন্তা করতে পারব’।

তার আব্বার ছুটির খবরে ভীষণ খুশী হয়ে উঠল রোসা। বলল, আব্বু আমাদেরও কলেজ বন্ধ হচ্ছে। চল না আব্বু আমাদের গ্রামে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসি’।

ডুপ্লে ও লেটি পরস্পরের দিকে চাইল। তাদেরও মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

‘ধন্যবাদ রোসা। তোমার প্রস্তাব আমাদের খুব পছন্দ হয়েছে’। বলল লেটি।

রোসা ছুটে এসে তার আব্বা ও আম্মার মাঝখানে বসে দু’জনকেই জড়িয়ে বলল।

প্যারিসে যখন ল্যান্ড করল বিমানটি রাত তখনও বাকি।

ছোট্ট একটি এ্যাটাসি কেস হাতে লাউঞ্জে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা।

চারদিক তাকাল।

তার চোখ দু'টি সন্ধান করল ফিলিস্তিন এ্যামবেসির কাউকে। কিন্তু কাউকে দেখল না। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা।

প্যারিস যাত্রার এক ঘন্টা আগেও ওদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে। এ্যামবেসিতেই আহমদ মুসার প্রথম যাবার কথা। ওখান থেকেই কিডন্যাপ হয়েছে ওমর বায়া। সামনে এগুতে হলে কিছু জানতে হবে ফিলিস্তিন দুতাবাস থেকে।

বিস্মিত আহমদ মুসা বেরিয়ে এল বিমান বন্দর থেকে।

যাত্রীরা প্রায় সবাই চলে গেছে। লাউঞ্জে বেশ দেরী করেছিল আহমদ মুসা।

বাইরে এসে ট্যাক্সির জন্যে সে সামনের দিকে নজর করতেই একটা হর্ণ কানে এল আহমদ মুসার। চমকে উঠে সেদিকে তাকাল। বুঝল ওটাই ফিলিস্তিন এ্যামবেসির গাড়ি। ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা সাইমুমের কোডে হর্ণ দিয়েছে।

আহমদ মুসার কাছে সবটা পরিস্কার হয়ে গেল। শত্রুপক্ষের নজর এড়াবার জন্যেই এ্যামবেসির পরিচিত কেউ বিমান বন্দরে আসেনি। সম্ভবঃত যে গাড়িটা এসেছে তাও এ্যামবেসির নয় এবং এ্যামবেসি থেকে আসা নয়।

আহমদ মুসার মুখে স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল। গাড়ির দিকে এগুলো আহমদ মুসা।

গাড়ির কাছাকাছি যেতেই আবার হর্ণ বাজিয়ে গাড়িটা নড়ে উঠল। কোডেড এ হর্ণের অর্থ হলো- স্বাগতম।

আহমদ মুসা গাড়ির কাছে দাঁড়াতেই গাড়ির দরজা খুলে গেল। জ্বলে উঠল গাড়ির ভেতরের আলো।

আহমদ মুসা দেখল, ড্রাইভিং সিটে একজন এবং তার পাশের সিটে আরেকজন বসা। দু'জনেই অপরিচিত, কিন্তু দু'জনেই আরব।

আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে বসল। পেছনের সিটে।

আহমদ মুসা সালাম দিল। উত্তর দিল ওরা দু'জনেই।

গাড়ি লাফিয়ে উঠে যাত্রা শুরু করল।

বিমান বন্দর এলাকা থেকে বেরিয়ে এল গাড়ি।

'আমরা নিশ্চয় এ্যামবেসিতে যাচ্ছি?' প্রথমে নীরবতা ভাঙল আহমদ মুসা।

'জি, জনাব'। পাশের লোকটি বলে উঠল।

'গাড়িটা নিশ্চয় এ্যামবেসি থেকে আসেনি?'

'জনাব ঠিকই বলেছেন'।

'ওরা কি এ্যামবেসির উপর খুব নজর রাখছে?'

'সম্ভবঃত ব্যাপারটা তেমন নয়, কিন্তু সাবধানতার জন্যেই এটা করা'।

'তোমরা?'

'আমরা আপনার সাইমুমের খুব নগণ্য কর্মী। প্যারিসের দু'টি ফার্মে আমরা দু'জন চাকরী করি। আপনাকে এ্যামবেসিতে পৌছে দেয়া আমাদের উপর নির্দেশ'।

এয়ারপোর্ট-হাইওয়ে ধরে ছুটে চলল সাইমুমের গাড়ি আহমদ মুসাকে নিয়ে।

নীরব চারদিক। হাইওয়েতেও গাড়ির ভীড় খুব কম। একশ পচিঁশ কিলোমিটার বেগে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে গাড়ি।

'সুন্দর ড্রাইভিং কর তো দেখছি। তোমার নাম কি?' ড্রাইভিং সিটের দিকে চেয়ে হাসি মুখে বলল আহমদ মুসা।

'জনাব পর্বত কি টিলার প্রশংসা করতে পারে? আপনার ড্রাইভিং-এর কথা শুনেছি স্যার'।

একটু থেমেই লোকটি বলল, 'আমার নাম আবু আবদুল্লাহ আমর। আর ওর নাম আহমদ জিয়াদ'।

'তোমরা কতদিন আছ প্যারিসে?'

'পাঁচ বছর'।

'অবস্থা কেমন মনে হচ্ছে তোমাদের কাছে?'

'কোনদিক দিয়ে স্যার?'

'এখানকার সংখ্যালঘু জাতি গোষ্ঠী বিশেষ করে মুসলমানদের কথা বলছি'।

'তাদের অধিকারের সীমানা ক্রমশঃ সংকীর্ণতর হয়ে উঠছে'।

'তোমার মতে এর কারণ কি বলত?'

'গভীরভাবে ব্যাপারটাকে আমি কখনও ভেবে দেখতে চেষ্টা করি নি। তবে আমার মনে হচ্ছে, এরা ধর্মনিরপেক্ষ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ থেকে সরে আসছে'।

'সরে কোথায় আসছে?' কথার সাথে আহমদ মুসার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'ধর্মীয় জাতীয়তার দিকে'।

'তোমার এ চিন্তার কারণ?'

গাড়িটা হঠাৎ ডান দিকে টার্ন নিল এবং আবার ছুটতে শুরু করল।

'হাইওয়ে ছাড়লে কেন? কোন পথে যাবে?' বলল আহমদ মুসা বাইরের দিকে নজর বুলিয়ে।

'আমরা যাচ্ছি শহরের এ প্রান্তের ডিপ্লোম্যাটিক জোনে। এ রাস্তাটি নিরিবিলি ও সংক্ষিপ্ত হবে'। বলল আবু আবদুল্লাহ আমর। সত্যিই এ রাস্তাটা একেবারেই জনশূন্য। একটা গাড়িও দেখা যাচ্ছে না।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে চাইল। সূর্য উঠার আরও দেড় ঘন্টা বাকি। 'আর কতক্ষণে আমরা পৌঁছব আমর?' বলল আহমদ মুসা।

'পনের মিনিট স্যার'।

কথা শেষ করেই ড্রাইভার আবু আবদুল্লাহ আমর দ্রুতকণ্ঠে বলে উঠল, ‘স্যার রাস্তায় একজন লোক পড়ে আছে’।

আহমদ মুসারও চোখে পড়ে গেছে। বলল, ‘হ্যাঁ লোকটার হাত-পা চোখ বাঁধা মনে হচ্ছে’।

বলতে বলতে গাড়িটা লোকটার সমান্তরাল এসে পৌছল।

‘গাড়ি থামাও’। দ্রুতকন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

লোকটার প্রায় পাশে এসে গাড়ি থামল।

গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা। তার সাথে আহমদ জিয়াদও।

পড়ে থাকা লোকটি উঠে বসেছে। সত্যিই তার দুই হাত-পা ও চোখ বাধা। বয়স সত্তরের বেশী হবে। মাথায় টাক। টাকের প্রান্ত দিয়ে চুলগুলো তুলোর মত সাদা। চোখ-মুখে দৃঢ় ব্যক্তিত্বের ছাপ।

আহমদ মুসা ও আহমদ জিয়াদ দু’জনেই গিয়ে দ্রুত তার চোখ ও হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল।

‘ধন্যবাদ ইয়ংম্যান তোমাদের সাহায্যের জন্যে’। লোকটি উঠে দাড়িয়েঁ কোটের কলার ও টাই ঠিক করতে করতে বলল।

‘ধন্যবাদ। আপনাকে আমরা আর কি সাহায্য করতে পারি? কোথায় যেতে চান আপনি?’ বলল আহমদ মুসা।

‘এ সময় বোধহয় গাড়ি পাব না। আমাকে বাড়ি পৌছে দিলে খুশী হবো’।

‘নিশ্চয় পৌছে দেব। আসুন’। বলে আহমদ মুসা গাড়ির দরজা খুলে ধরল।

গাড়িতে উঠে বসল বৃদ্ধ।

আহমদ মুসা গাড়ির দরজা বন্ধ করে ওপাশ দিয়ে বৃদ্ধের পাশে উঠে বসল।

‘শার্লেম্যান সার্কেল। এখান থেকে বেশ দুর। অসুবিধা হবে না তো তোমাদের?’ বলল বৃদ্ধটি।

‘না, কোন অসুবিধা নেই। আমর তুমি চেননা শার্লেম্যান সার্কেল?’ বলল আহমদ মুসা।

‘চিনি জনাব’। বলল ড্রাইভার।

গাড়ি ঘুরে আবার এয়ারপোর্ট হাইওয়েতে ফিরে এল। তারপর আবার ছুটে চলল শহরের দিকে। শার্লেম্যান সার্কেল শহরের একেবারে বিপরীত প্রান্তে। শহরের একটা অভিজাত এলাকা ওটা।

‘তোমরা তো সবাই বিদেশী দেখছি। কিন্তু তুমি তো এই রাতে প্যারিসে ল্যান্ড করলে?’ আহমদ মুসার দিকে একটু মুখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল বৃদ্ধটি।

‘কি করে বুঝলেন?’ আহমদ মুসার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।

‘খুব সহজ ইয়ংম্যান, তোমার দিক থেকে একটা সেন্ট আসছে। সে সেন্টটা প্যান ইসলামিক এয়ারলাইন্সের রিফ্রেসারেই শুধু পাওয়া যায়। এবং এ সেন্ট এক ঘন্টার বেশী থাকে না। সুতরাং ...’।

আহমদ মুসা বিস্ময়ের সাথে বৃদ্ধের দিকে তাকাল। মনে মনে ভাবল, লোকটিকে সে যতটা অসাধারণ মনে করেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী অসাধারণ।

‘জি, ঠিকই বলেছেন। আমি এক ঘন্টার মত হলো ল্যান্ড করেছি’।

‘তোমার খুব কষ্ট হলো। তোমরা তো যাচ্ছিলে ডিপ্লোম্যাটিক জোনে। এতক্ষণ তুমি রেস্টে যেতে পারতে’।

আহমদ মুসার আবার বিস্মিত হবার পালা। বলল, ‘কেমন করে বুঝলেন আমরা ডিপ্লোম্যাটিক জোনে যাচ্ছিলাম?’

‘খুব সোজা। প্যারিসের ম্যাপ তোমার সামনে থাকলে তুমিও বলতে পারতে। এ রাস্তায় যারা আসে, তারা হয় ডিপ্লোম্যাটিক জোনে যায়, নয়তো শহর পেরিয়ে ওদিকে চলে যায়’।

শার্লেম্যান সার্কেলে প্রবেশ করল গাড়ি। বৃদ্ধ আমরকে বুঝিয়ে দিল কোন পথে কোথায় যেতে হবে।

বাগান ঘেরা সুন্দর একটা বাঙলোর সামনে এসে গাড়ি থামল।

গেট বক্স থেকে দু’জন পুলিশ ছুটে এল।

উকি দিয়ে বৃদ্ধকে দেখেই লম্বা স্যালুট দিল তাকে। তাদের চোখে-মুখে বিস্ময় ও আনন্দের বিচ্ছুরণ।

স্যালুট শেষ করে একজন ছুটে গেল ভেতরে।

বৃদ্ধ নামল গাড়ি থেকে। আমন্ত্রণ জানাল আহমদ মুসাদেরকেও নামার জন্যে।

'ধন্যবাদ জনাব, আপনাকে আর কষ্ট দেব না'। বলল আহমদ মুসা।

'দেখ, তোমার রেস্ট নেবার জায়গা এখানেও আছে। নেমে এস'।

নামল আহমদ মুসারাও।

বাড়ির ভেতর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল পঞ্চাশোর্ধ একজন মহিলা এবং এক তরুণী।

বৃদ্ধকে এসে জড়িয়ে ধরল মহিলা ও তরুণীটি।

আহমদ মুসা ও তার সাথের দু'জন বসেছিল ড্রইং রুমে। মিনিট পাচেঁক পর বৃদ্ধটি ড্রইং রুমে ফিরে এল। তার সাথে মহিলা ও তরুনীটিও।

ওরা ড্রইং রুমে ঢুকতেই আহমদ মুসা বলল, 'আমাদের ফজর নামাযের সময় হয়েছে। আমরা কি...'।

'ফজর নামায?' বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল বৃদ্ধটি।

'মর্নিং প্রেয়ার'। বলল আহমদ মুসা।

'বুঝেছি, কি দরকার বল'।

'কিছু নয়। আমরা একটু টয়লেট ব্যবহার করব। এই কার্পেটে কিংবা করিডোরেও নামায হতে পারে'।

'ঠিক আছে। এস'। বলে মহিলাটি হাসি মুখে গিয়ে টয়লেট দেখিয়ে দিল'।

ড্রইং রুমের এক পাশে তিনজনে ওরা নামায পড়ল।

ওরা তিনজন নীরবে বসে নামায দেখছিল। ওদের সবার মুখ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ।

নামায শেষ করে আহমদ মুসারা এসে বসল।

'এদের সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি ইয়ংম্যান'। তারপর মহিলাকে দেখিয়ে বলল, 'এ আমার স্ত্রী, আর ও আমার মেয়ে ক্লাউডিয়া'।

বৃদ্ধ কথা শেষ করতেই মহিলাটি বলল, 'তোমাদের প্রেয়ার তো খুবই সুন্দর। তুমি উচ্চারণ করলে ওটা কোন ভাষা?' আহমদ মুসার দিকে লক্ষ্য মহিলাটির।

'ওটা আরব ভাষা'।

'মাতৃভাষা?'

'মাতৃভাষা যাই হোক, প্রার্থনার ভাষা আরবী'।

'সামনে যে দাঁড়ায় তিনি বুঝি নামায পরিচালনা করেন?' বলল ক্লাউডিয়া।

'হ্যাঁ'। বলল আহমদ মুসা।

'আপনি কি ধর্ম নেতা, যেমন আমাদের বিশপ, ফাদার?'

'না। মুসলমানদের নামায পরিচালনা যে কোন মুসলমানই করতে পারে'।

ক্লাউডিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিয়ে বৃদ্ধ বলল, 'ওরা খুব টায়ার্ড। কিছু দাও এদের'। বৃদ্ধের দৃষ্টি মহিলার দিকে।

'বলে দিয়েছি। আসছে'। বলল মহিলা।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসাদের দিকে চেয়ে বলল, 'আমরা তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ বাবারা। ওকে উদ্ধার করে কষ্ট করে নিয়ে এসেছ'। মহিলার কণ্ঠস্বর ভারি।

'এইটুকু কাজের জন্যে এভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে ছেলেদের প্রতি অন্যায় করা হয় মা'। বলল আহমদ মুসা।

'তোমরা সত্যিই ভাল ছেলে। তোমরা ঈশ্বরের প্রার্থণা কর। এমনটা তো আজ দুর্লভ'। বলল মহিলা।

'এই দেখ তোমাদের নামটাও জানা হয়নি'। বলল বৃদ্ধ।

আহমদ মুসা মুহুর্তকাল দ্বিধা করল। তারপর ওদের দু'জনের নাম বলে নিজের নাম বলল, আহমদ মুসা।

হঠাৎ করেই চোখটা কিছুটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল বৃদ্ধের।

এই সময় নাস্তা এল। নাস্তা বলতে কিছু স্ন্যাকস এবং শ্যাম্পেন।

আহমদ মুসারা সবার সাথে স্ন্যাকস খেল। কিন্তু মদ স্পর্শ করল না।

'কি, তোমরা শ্যাম্পেন খাও না?' বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করল মহিলাটি।

'না, আমরা মদ খাই না'।

'খাও না?' মহিলাসহ সবার চোখে এক রাশ বিস্ময়।

কিন্তু বৃদ্ধের চোখে বিস্ময় নেই। তার চোখে আগের সেই তীক্ষ্নতা এবং দুর্লভ কোন জিনিস খুজেঁ পাওয়ার ঔজ্জ্বল্য।

'তোমরা খুবই ভাল ছেলে। এমনটা আমি চোখে দেখিনি'। বলল মহিলাটি।

'মুসলমানদের কয়েকজনকে তো আমি মদ খেতে দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে?' বলল ক্লাউডিয়া।

আহমদ মুসা হাসল। বলল, 'আইন ও নীতি তো সবাই মানে না'।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা বলে উঠল, 'আপনাদের আর কষ্ট দেব না। আমরা এখন উঠতে চাই'।

বৃদ্ধের ঠোটেঁ হাসি। একটু নড়ে-চড়ে বসে বলল, 'কিন্তু তোমরা তো আমার কথা আমার পরিচয় কিছুই জিজ্ঞাসা করলে না?'

আহমদ মুসা সলজ্জ হেসে বলল, 'আপনাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। তবে যারা কিডন্যাপ করেছিল তারা মনে হয় আপনাদের শত্রু নয়'।

'কি করে বুঝলে এসব কথা?' বৃদ্ধের মুখে হাসি।

'আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ, কলম, ঘড়ি, চশমা, হ্যাটসহ যে ভাবে আপনাকে পেয়েছি তাতে এটাই মনে হয়েছে'। বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আবার শুরু করল, 'আপনি ফরাসি গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ একজন সাবেক সদস্য'।

'কি করে বুঝলে?'

'পুলিশের স্যালুট দেয়া এবং আপনাকে দেখে'।

মহিলাটি এবং ক্লাউডিয়া নীরবে শুনছিল। তাদের চোখে বিস্ময়।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল, 'আমার কিন্তু জানতে ইচ্ছা করছে, শত্রু নয় অথচ ওরা আপনাকে কিডন্যাপ করল কেন?'

'বলব আমি কিন্তু তার আগে বল, তোমাকে আমি যা ভাবছি তুমি তাই কিনা?'

আহমদ মুসা মুখ তুলে পূর্ণভাবে তাকাল বৃদ্ধের দিকে।

বৃদ্ধের এই কথায় তার স্ত্রী এবং কন্যা ক্লাউডিয়া বিস্ময় দৃষ্টি নিয়ে তাকাল একবার বৃদ্ধের দিকে আরেকবার তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

'আপনার ভাবনা ঠিক হতেই হবে'। মুখ নিচু করে বলল আহমদ মুসা।

সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে দিয়ে আহমদ মুসার সাথে হ্যান্ডশেক করে বলল, 'ওয়েলকাম। তোমাকে 'তুমি' বলার জন্যে আমি দুঃখিত। কিছু মনে করো না। আমি তোমার পিতার বয়সের'।

মহিলা এবং ক্লাউডিয়া দু'জনেরই চোখ বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে।

'আব্বা, কি বলছ আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না'। বলল ক্লাউডিয়া।

'মা, তোমরা যাকে চোখে দেখছ, যার সাথে কথা বলছি, তিনি বিস্ময়কর চরিত্র, কিংবদন্তির নায়ক আহমদ মুসা'।

'কি বলছেন আব্বা!'- বলে বিস্ময়ে দাড়িয়েঁ গেছে ক্লাউডিয়া। আর তার মা'র চোখে বোবা দৃষ্টি।

'অবিশ্বাস্যই মা'।

'আমাকে এভাবে লজ্জা দেবেন না। আমি আমার জাতির একজন নগণ্য কর্মী'। বিব্রত আহমদ মুসার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

'আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি আহমদ মুসা তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে। অনেক ভেবেছি আমি তোমার কথা। আমার বাড়িটা সত্যিই ধন্য হলো। এটা আমার জন্যে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা'।

একটু থেমেই আবার বলল, 'কিছু মনে করো না। আমার কৌতুহল হচ্ছে, ফ্রান্সে তোমার আগমন কেন? বড় কিছু না ঘটলে তুমি কোথাও যাও না। এই কিছুদিন আগে তো ফ্রান্স থেকে গেলে'।

সঙ্গে সঙ্গেই কথা বলল না আহমদ মুসা।

বৃদ্ধ, ক্লাউডিয়া এবং তার মা সকলের উদগ্র দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসার মুখ নিচু।

ক্লাউডিয়া এবং তার মা ভেবে পাচ্ছে না, এমন শান্ত ও সলজ্জ মানুষ এত বড় বিপ্লবী কি করে হতে পারে।

আহমদ মুসা একটু মুখ তুলল। বলল, 'বড় কোন ঘটনা ঘটেনি। আমাদেরই এক ভাইকে কিডন্যাপ করা হয়েছে'।

'কিন্তু এই ঘটনায় তোমার আসাটা......'।

কথা শেষ না করেই থামল বৃদ্ধ।

'সে একজন ব্যক্তি মাত্র নয়। তার ধ্বংস হওয়ার মধ্যে দিয়ে গোটা দক্ষিণ ক্যামেরুনকে মুসলিম স্বার্থের ধ্বংস সম্পূর্ণ হয়ে যাবে'।

'বুঝেছি। তাকে কারা কিডন্যাপ করল?'

'ঠিক জানি না। তবে পশ্চিম আফ্রিকার খৃষ্টান মিশনারী এবং সেখানকার গোপণ খৃষ্টান জংগ সংগঠন তাকে তাড়া করে ফিরছে'।

'ঐ সংগঠন কি 'কোক' (কিংডোম অব ক্রাইস্ট) এবং 'ওকুয়া' (আর্মি অব ক্রাইস্ট অব ওয়েস্ট আফ্রিকা)?'

'জি'।

একটু চিন্তা করল বৃদ্ধ। তারপর বলল, 'কোক' কিংবা 'ওকুয়া'র কোন ক্ষমতা নেই ফ্রান্সে কোন অপারেশন চালাবার'।

থামল। একটু ভাবল বৃদ্ধ। বলল আবার, 'কোত্থেকে কিভাবে তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে?'

'ফিলিস্তিন দুতাবাসের গাড়ি থেকে। দিনের বেলা। দুতাবাসের সামনের রাস্তা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়'। বলল আবু আবদুল্লাহ আমর।

'আহমদ মুসা, আমি নিশ্চিত এ কাজ 'ব্ল্যাক ক্রস'-এর, তবে এরা কোন অপরাধী সংগঠন নয়'।

'ব্ল্যাক ক্রস?' প্রশ্ন আহমদ মুসা। তার কপাল কুঞ্চিত।

'ইউনিভারসাল হোলিক্রস- নামক এন.জি.ও'এর নাম নিশ্চয় তুমি জান'।

'জি'।

‘এই ইউনিভারসাল হোলিক্রস’- এরই আন্ডার গ্রাউন্ড নাম ‘ব্ল্যাস ক্রস’। এক সংগঠনের দুই মুখ। ইউ এইচ সি (UHC)-এর নামে তারা দুনিয়ায় সেবামূলক কাজ করে এবং ব্ল্যাক ক্রস-এর নামে তারা খৃষ্টান স্বার্থে যা প্রয়োজন তাই করে’।

‘এরা কি অপরাধী সংগঠন নয়?’

বৃদ্ধ হাসল। বলল, ‘হ্যাঁ আমি বলেছি ওরা অপরাধী সংগঠন নয়। তার অর্থ হলো, নিছক অর্থ-সম্পদের জন্যে এরা সন্ত্রাস বা খুনোখুনি করে না। অর্থ-সম্পদ এদের লক্ষ্য নয়। এদের লক্ষ্য গোটা বিশ্বের খৃষ্টকরণ। খৃষ্টান বিশ্বাসের, অন্যকথায় খৃষ্টান নিয়ন্ত্রণ প্রসারের জন্যে কোন কিছু করতেই তারা পিছপা হয় না। সুতরাং সাধারণভাবে অপরাধী বলতে যা আমরা বুঝি, সে ধরণের অপরাধী তারা নয়’।

‘ব্ল্যাক ক্রসের সাথে যাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, সেই ওমর বায়ার তো কোন শত্রুতা নেই। তাহলে তারা তাকে কিডন্যাপ করলো কেন?’

‘আমি মনে করছি, ‘ওকুয়া’ ব্ল্যাক ক্রসের সাহায্য চেয়েছে। ব্ল্যাক ক্রস এতে সাড়া দিয়ে তাকে সাহায্য দিচ্ছে। এবং এটা খুবই স্বাভাবিক। খৃষ্টান ধর্মের সম্প্রসারণ উভয়েরই লক্ষ্য। তাছাড়া কিছু অর্থযোগও থাকতে পারে’।

‘বুঝেছি জনাব। আমাদের সংঘাতটা তাহলে ব্ল্যাক ক্রস- এর সাথে’।

‘ঠিক। কিন্তু তুমি কি ব্ল্যাক ক্রস-এর সাথে লড়াইয়ে নামতে চাও? বাঘদের রাজ্যে কি বাঘের সাথে লড়াইয়ে নামা উচিত?’

‘উচিত কি না সে বিচার তখন করা যায়, যখন বিকল্প থাকে। আমাদের সামনে কোন বিকল্প নেই জনাব’।

‘ঠিক বলেছ বৎস। কিন্তু আমি ভাবছি জেনেশুনে আগুনে ঝাঁপ দেয়া কি ঠিক? তুমি বোধ হয় জান না, ফরাসি পুলিশ অফিসারদের উপর ‘ব্ল্যাক ক্রস’- এর প্রভাব। বলতে পার, ব্যক্তিগত ভাবে পুলিশ ও পুলিশ অফিসাররা তাদের প্রতি অনুগত বা সহানুভূতিশীল। সুতরাং পুলিশের সত্যিই কোন সাহায্য পাবে না। আর ব্ল্যাক ক্রস- নাজীদের গেষ্টাপো বাহিনীর মতই সর্বব্যাপী এবং তাদের মতই

নিষ্ঠুর। ফ্রান্সে এসে তুমি ওদের সাথে লড়াইয়ে নাম, আমার মন এতে কিছুতেই সায় দিচ্ছে না'।

'আপনার শুভেচ্ছার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি জয়ের জন্যে ওদের সাথে লড়াইয়ে নামছি না জনাব। আমার কাজ একজন মজলুম মানুষকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করা। এটা আত্মরক্ষার লড়াই। জয়ের জন্যে যে লড়াই সেখানে অনেক হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন হয়, আত্মরক্ষার লড়াইয়ে তার কোন হিসেব-নিকেশের অবকাশ থাকে না'।

আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল। দু'পা এগিয়ে এসে আহমদ মুসার পিঠ চাপড়ে উচ্ছ্বসিত কন্ঠে বলল, আবিস্মরণীয় একটা কথা বলেছ বৎস। তুমি শুধু বিপ্লবী নও, বিপ্লবীর চেয়ে বড় তুমি মানুষ। ভালবাসা ছাড়া শুধু দায়িত্ববোধ মানুষকে এতবড় করতে পারে না'।

'ধন্যবাদ জনাব। মানুষের এইভাবে ভালবাসা আমাদের ধর্মের শিক্ষা'।

'এ শিক্ষা তো খৃষ্টেরও'। বলল ক্লাউডিয়া। ক্লাউডিয়া এবং তার মা মন্ত্রমুগ্ধের মত এতক্ষণ এই আলাপ শুনছিল।

আহমদ মুসা মুখ তুলে ক্লাউডিয়ার দিকে তাকাল। ঠোটেঁ এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল তার। বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, কিন্তু খৃষ্টের এ শিক্ষার সাথে দায়িত্বরোধের তাগিদ নেই। আমাদের ধর্মে মানুষকে ভালবাসার সাথে সাথে অন্যায়কে প্রতিরোধ করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ অর্পিত দায়িত্বের দাব হলো, অসীম ভালবাসা নিয়ে মানুষের দুঃখে বসে বাসে আমি শুধু কাঁদব না, দুঃখের যা কারণ তার প্রতিরোধেও এগিয়ে যাব'।

'এতে দায়িত্ব পালন হবে ঠিকই, কিন্তু এই দায়িত্ব পালন আবার অনেক দুঃখ, অনেক অশ্রু এবং এমনকি অনেক জীবনহানিরও কারণ ঘটাবে'। বলল ক্লাউডিয়া। সামনে দিয়ে আড়াআড়ি রাখা ডান হাতের উপর ঠেস দেয়া বামহাতের তালুতে রাখা ক্লাউডিয়ার মুখ। তার মুগ্ধ দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

বিশ-একুশ বছরের মত বয়স ক্লাউডিয়ার। পরনে কাল প্যান্ট, সাদা শার্ট। প্রথমে নাইট গাউন পরেই ছুটে বাইরে এসেছিল। পরে ভেতরে গিয়ে বদলে

ফেলেছে। ক্লাউডিয়ার সোনালী চুলের নিচে নীল চোখ এবং নীল-সাদায় মিশানো মুখ।

‘গাছ রক্ষার জন্যে আগাছা নির্মূলের প্রয়োজন হয়। একজন অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে শত অপরাধের পথ বন্ধ করতে হয়। গোটা প্রকৃতি জুড়েই এই দৃশ্য মিস ক্লাউডিয়া। সূর্যের আলো প্রতিবিম্বিত করে পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্যেই চাঁদকে মরতে হয়েছে’।

ক্লাউডিয়ার চোখে বিস্ময় বিমূঢ়তা। ক্লাউডিয়ার মা এবং তার আব্বা বৃদ্ধের চোখেও সপ্রশংস দৃষ্টি।

আপনি বিপ্লবী না দার্শনিক। আমি পলিটিক্যাল সাইন্সের ছাত্রী। জগতের পরিচিত বিপ্লবীদের আমি জানি। তাদের মধ্যে আমি দেখেছি বিপ্লবের জন্যে স্বেচ্ছাচারিতা। কিন্তু আপনার লক্ষ্য দেখছি সত্যনিষ্ঠার জন্যে বিপ্লব। এ হলো দার্শনিক বা ভাববাদীর দৃষ্টি। ক্লাউডিয়া বলল।

‘আমি কিছুই নই মিস ক্লাউডিয়া। আমি মুসলিম। সব ভাল দৃষ্টি, সব ভাল গুণ নিয়েই একজন মানুষ মুসলিম হয়। একজন মুসলিমের সাথে তাই অন্য বিপ্লবীদের পার্থক্য হবেই’। গম্ভীর কন্ঠ আহমদ মুসার।

‘মুসলিম ছাড়াও তো কেউ এই গুণগুলো অর্জন করতে পারে’। বলল ক্লাউডিয়াই। তারও গম্ভীর কন্ঠ।

‘তা পারে। কিন্তু সেটা তার নিছক ইচ্ছার অধীন। ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটলে সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটতে পারে। অন্যদিকে মুসলমানদের এই পারাটা ঐশী আইনের অধীন। যা মুসলমানরা ভংগ করতে পারে না। কারণ ঐশী বিধানই বলেছে, প্রত্যেক কাজের জন্যে তাকে পরকালে জওয়াবদিহি করতে হবে।। যার ফল হিসেবে সে পাবে অনন্ত পুরস্কার, অথবা সম্মুখীন হবে অনন্ত শাস্তির’।

ক্লাউডিয়া আর কথা বলল না। তার চোখে আনন্দ, বিস্ময় আর গভীর ভাবনার ছাপ।

কথা বলল ক্লাউডিয়ার আব্বা সেই বৃদ্ধ। বলল, ‘আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি তোমার সাথে পরিচিত হতে পেরে। তোমার সবচেয়ে বড় পরিচয় মনে হচ্ছে আমার কাছে পৃথিবীর শত কোটি মানুষের ভীড়ে দৃষ্টান্ত

হওয়ার মত একজন মানুষ তুমি। ধার্মিকতা, চরিত্র, সাহস ও সংগ্রাম সবই আছে যার মধ্যে। তাই আমার কষ্ট হচ্ছে তোমার সামনের অন্ধকার পথের দিকে তাকিয়ে'।

একটু থেমেই বৃদ্ধ আবার শুরু করল, আমার বয়স হয়েছে। করণীয় কিছুই ভাবতে পারছি না। দেখ, আমি ক্লাউডে বেবিয়ার, দশ বছর ফরাসি গোয়েন্দা বিভাগের চীফ ছিলাম। তিনদিন আগে আমাকে কিডন্যাপ করা হয়। যদিও এই তিন দিনই আমার চোখ বাঁধা ছিল, যদিও লাউড স্পিকারে আমার সাথে ওরা কথা বলেছে, তবু আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি ওরা 'ব্ল্যাক ক্রস'- এর লোক। কতখানি...।

আহমদ মুসা বৃদ্ধ মিঃ ক্লাউডে বেবিয়ারের কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ব্ল্যাক ক্রস আপনাকে কিডন্যাপ করেছিল? কেন?'

হাসল বৃদ্ধ ক্লাউডে বেবিয়ার। বলল, 'আমি নাকি এমন 'থট রিডিং' জানি এবং এমন সম্মোহন আমি জানি যে, মানুষের মনের কথা বের করে আনতে পারি এবং মানুষকে বশে এনে যা ইচ্ছা বলাতে পারি। তারা চেয়েছিল আমি তাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করি'।

'কিন্তু কিডন্যাপ করল কেন? এমনিতেই তো সাহায্য চাইতে পারতো'।

'এ ধরনের কোন কাজে সাহায্য আমি তাদের করব না, এটা তারা জানে। তাছাড়া পেশায় থাকতে যা আমি করেছি, তা এখন আর আমি করি না এটাও তারা অবগত'।

'আপনি নিশ্চয় ওদের সাহায্য করেননি, তাহলে ওরা ছাড়ল কেন আপনাকে?'

'অনুরোধসহ চাপ, হুমকি, সবই তারা শুরু করেছিল, আরও কি করতো জানি না। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হঠাৎ তাদের মর্তের পরিবর্তন ঘটে। তাদের আচার-আচরণে বুঝেছি তাতে যে কারণে আমাকে ওরা নিয়ে গিয়েছিল, সে প্রয়োজন তাদের মিটেছে'।

'হতে পারে। ব্ল্যাক ক্রসের সাম্রাজ্য তো শুধু ফ্রান্স নয়'।

আহমদ মুসা চিন্তা করছিল। একটু পরে বলল, তারা কার থট রিডিং বা কাকে তারা সম্মোহন করতে চেয়েছিল তা কি আপনি জানতে পেরেছেন?'

'না বৎস। কেন?'

'আমার অনুমান মিথ্যা না হলে তাদের সেই টার্গেট লোকটি ওমর বায়া, আমাদের লোক যাকে ওরা কিডন্যাপ করেছে'।

'হতে পারে, তাদের টার্গেটকে ওরা বিদেশী একজন ঘোর শত্রু বলে পরিচয় দিয়েছে'।

আহমদ মুসার মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ওমর বায়া বেঁচে আছে এ ব্যাপারে সে অনেকখানি নিশ্চিত হলো।

বৃদ্ধ ক্লাউডে বেবিয়ার কথা শেষ করতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

মিঃ ক্লাউডে উঠে গেল টেলিফোন ধরতে।

সবাই চুপচাপ।

ক্লাউডিয়া এবং তার মা তাকিয়ে টেলিফোনের দিকে। তাদের চোখে-মুখে প্রশ্ন। এই সাত সকালে টেলিফোন এখানে অস্বাভাবিক।

আহমদ মুসাও সেদিকে তাকিয়েছিল। আহমদ মুসা দেখল টেলিফোন ধরেই মিঃ ক্লাউডের ভ্রু কুঁচকে গেল। দু'এক কথা বলছে, শুনছেই বেশী। ধীরে ধীরে তার মুখ উদ্বেগে ভরে গেল।

টেলিফোন শেষ করে ফিরে এল মিঃ ক্লাউডে। তার বিব্রত, উদ্বিগ্ন দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

ক্লাউডিয়া ও তার মা দু'জনের চোখেই উদ্বেগ এবং একরাশ প্রশ্ন।

মিঃ ক্লাউডে বসতে বসতে বলল, 'ব্ল্যাক ক্রসের কাছে আমাদের সব কথা চলে গেছে আহমদ মুসা'। গম্ভীর মুখ ক্লাউডের।

'খুবই স্বাভাবিক'। নিরুদ্বিগ্ন কন্ঠ আহমদ মুসার।

'স্বাভাবিক বলছ? তাহলে ওরা এখানে কোথাও কোন গোয়েন্দা ফোন ট্রান্সমিটার রেখে গেছে?'

'রেখে গেছে নয়, পাঠিয়েছে'।

‘বলছ, আমার দেহে কোথাও গোয়েন্দা ট্রান্সমিটার চিপস আমি বহন করছি?’

‘আমি তাই মনে করছি জনাব’।

একটু ভাবল মিঃ ক্লাউডে। বলল, ‘বহনকারী সে স্থান সম্বন্ধে তুমি সন্দেহ করেছ?’

‘আপনার চুল ধুয়ে ফেলবেন, পোষাক পাল্টাবেন, জুতাও। সুতরাং এগুলো ট্রান্সমিটার চিপস-এর জন্যে নিরাপদ নয়। আপনার দেহে নিরাপদ জিনিস একটাই, সেটা হলো আপনার আংটি। ওখানেই আছে ওদের গোয়েন্দা চিপসটা’।

মিঃ ক্লাউডের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ধন্যবাদ। তুমি অনন্য আহমদ মুসা। এত দ্রুত তুমি সিদ্ধান্ত করতে পার!’

বলেই ক্লাউডে হাত থেকে আংটি খুলে রুমালে জড়িয়ে বলল, ‘আমি এখনি রেডিও সিগন্যাল ও বিকিরণ টেষ্টের জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি’।

‘আপনার পোষাক এবং জুতাও পাল্টে ফেলা দরকার জনাব’।

‘ঠিক বলেছ’ বলে উঠে গেল মিঃ ক্লাউডে।

পোষাক পাল্টে দু’মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল।

কথা বলছিল তখন বিস্ময় বিমূঢ় ক্লাউডিয়া। ‘আপনি তো গোয়েন্দা কর্মী নন। শীর্ষ নেতারা গোয়েন্দা কর্মী ব্যবহার করেন এসব কাজে কিন্তু আপনি কি করে এতবড় অনুমান করতে পারবেন?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘গোয়েন্দা, অগোয়েন্দা সকলের একই চোখ, একই মাথা’।

মিঃ ক্লাউডে ফিরে আসতেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘আমাদের এবার উঠতে হবে জনাব’।

মিঃ ক্লাউডে চোখ কপালে তুলে বলল, ‘ব্ল্যাক ক্রস কি বলল সেটা বলাই হয়নি’।

‘কি বলেছে জানি জনাব’।

আহমদ মুসাকে বসতে বলে নিজে বসতে বসতে বলল মিঃ ক্লাউডে, 'জান তুমি? বলত কি বলতে পারে?'

আপনাকে 'আহমদ মুসা নামক লোকটিকে জানাতে বলেছে, আদার ব্যাপারি হয়ে জাহাজের সন্ধান যেন না করি। ওমর বায়ার ব্যাপারে নাক গলালে, নাক নয় জীবনটাই ছিড়েঁ ফেলা হবে। ইত্যাদি'।

'বিস্ময় বোধ করছি না আহমদ মুসা। তোমার কাছে বোধ হয় অসম্ভব কিছু নেই। তবে আরেকটি কথা ওরা বলেছে। আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছে আমি তোমাকে সহযোগিতা করতে চাইনি বলে। আর আমার কাছে ওরা মাফ চেয়েছে'।

একটু থামল মিঃ ক্লাউডে। তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'তোমাকে সহযোগিতা করার আমার সত্যিই কিছু নেই। শুধু তোমাকে কয়েকটা তথ্য দিচ্ছি এক, ওদের প্রত্যেকের গলায় ব্ল্যাক ক্রস ঝুলানো থাকে। ওটাই ওদের চিহ্ন। দুই, ওরা অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী, নিজেদের শক্তি সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা। এটাই ওদের দুর্বলতা এবং তিন, কোন শত্রুকে হাতে পেলে আর বাচিয়েঁ রাখে না'।

'ধন্যবাদ জনাব। তিনটাই অত্যন্ত মূল্যবান ইনফরমেশন'।

আহমদ মুসা থামতেই ক্লাউডিয়ার মা নরম কন্ঠে বলে উঠল, 'তোমার কে আছে? বাবা, মা, ভাই, বোন, স্ত্রী ...'।

আহমদ মুসা মুখ নিচু করল। হঠাৎ করেই যেন বেদনার একটা ছায়া নেমে এল তার সারা মুখ জুড়ে। বলল, 'আমার কেউ নেই মা। কিন্তু সবই আছে। পৃথিবী জুড়ে সব মা'ই আমার মা, সব বাবাই আমার আব্বা, সব ভাই-বোনই আমার ভাই-বোন'।

'কেউ নেই? তোমার বাড়ি কোথায় বাবা?'

'যার কেউ নেই তার বাড়ি থাকারও প্রয়োজন হয় না মা। যখন যেখানে থাকি সেটাই আমার বাড়ি'।

'কি বলছ তুমি, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এতবড় আহমদ মুসা এত একা, এত নিঃসব!'

'মায়েরা এভাবেই ভাবে কিন্তু আমি নিঃস্ব, একা নই মা'। নরম কন্ঠ আহমদ মুসার।

'মায়েদের ভাবনাকে কি বেঠিক বলবে?'

'না তা পারি না মা। কিন্তু মেনে নেয়াও উচিত মনে করি না'।

'দায়িত্ব দিয়ে হৃদয়ের দহনকে তুমি আড়াল করতে পার, কিন্তু অস্বীকার করতে পার না বাছা'।

'ধন্যবাদ মা, সন্তানকে মায়েদের চেয়ে আর কেউ ভালো জানতে পারে না'। ম্লান হাসি আহমদ মুসার ঠোঁটে, আর কষ্টকর এক বেদনা তার মুখে।

ক্লাউডিয়া নিষ্প্রাণ মূর্তির মত বসে আছে আহমদ মুসার দিকে চেয়ে। তার ঠোঁট শুকনো। দু'চোখে তার সজল বেদনার একটা আস্তরণ। একজন অনন্য বিপ্লবীর এক অন্তহীন নিঃস্বতার বেদনা তার হৃদয়কে মুষড়ে দিয়েছে। এই নিঃস্ব আহমদ মুসাকেই তার সবচেয়ে বড় সব চেয়ে কাছের, সবচেয়ে স্বচ্ছ মনে হচ্ছে।

আহমদ মুসা কথা শেষ করেই মিঃ ক্লাউডের দিকে চেয়ে বলল, 'এবার আমাদের উঠতে হয়'।

'আপনি আপনার বিপদ বুঝতে পারছেন? রাস্তায় নামলেই আপনি আক্রান্ত হতে পারেন। আব্বাকে ওরা প্রকাশ্যে দিবালোকে কিডন্যাপ করেছিল'। শুকনো কন্ঠে বলল ক্লাউডিয়া।

আহমদ মুসা তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আমি তো এটাই চাচ্ছি। আমি ওদের চিনি না। ওরা আমার কাছে না এলে, আমার পক্ষে ওদের কাছে পৌছা মুস্কিল হবে'। ম্লান হাসি আহমদ মুসার ঠোটেঁ।

'আপনি তো শুনলেন, ওরা কোন শত্রুকেই জীবিত রাখে না'।

'এটা ওদের চেষ্টা। ওদের সব চেষ্টাই কি সফল হয়েছে, না হবে?'

বলেই আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

উঠে দাঁড়াল সবাই।

মিঃ ক্লাউডে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ধরল।

বেরিয়ে এল সকলে।

করিডোর দিয়ে হাঁটছিল সবাই। সবার আগে হাঁটছিল মিঃ ক্লাউডে। তার ডান পাশে আহমদ মুসা। আহমদ মুসার ডান পাশে মিস ক্লাউডিয়া।

‘আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ভোর আজ। আপনার জীবনে তো অজস্র বড় ঘটনা, এমন দিনের কথা অবশ্যই আপনার মনে থাকবে না’।

‘অধিকাংশ স্মৃতিই কষ্টের হয়। সুতরাং ভুলে যাওয়ার মধ্যেই তো মঙ্গল’।

‘কিন্তু এই কারণে যারা ভুলে যেতে চায়, তারা কিন্তু ভুলতে পারে না’।

আহমদ মুসা চোখ তুলে তাকাল মিস ক্লাউডিয়ার দিকে। বলল, ‘আপনি কিসের ছাত্রী?’

‘বলেছি আমি রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ছাত্রী’।

এই সময় কথা বলে উঠল মিঃ ক্লাউডে। বলল, ‘ব্ল্যাক ক্রস শুধু হিংস্র নয়, ওরা অত্যন্ত ক্ষীপ্র। সময় নষ্ট ওরা করে না। সুতরাং ক্লাউডিয়ার কথা ফেলে দিও না। রাস্তায় তোমাকে সাবধান হতে হবে’।

গাড়ির কাছে ওরা পৌছে গিয়েছিল।

‘ধন্যবাদ জনাব মনে থাকবে’। বলে ক্লাউডিয়ার মা’র দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মা, অসময়ে আপনাদের কষ্ট দিয়ে গেলাম’।

তারপর মিঃ ক্লাউডে’র সাথে হ্যান্ডশেক করে গাড়ির দিকে ফিরল।

আমররা গাড়িতে উঠে বসেছিল।

আহমদ মুসা গাড়ির দিকে ঘুরতেই মিস ক্লাউডিয়া গাড়ির দরজা খুলে ধরল।

আহমদ মুসা ওর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, ‘ধন্যবাদ’।

বলে গাড়িতে উঠে বসল আহমদ মুসা।

মিস ক্লাউডিয়া একটু নিচু হয়ে মুখটা গাড়ির দরজার ফাকেঁ এনে বলল, ‘সৃষ্টির চলার পথ কিন্তু বৃত্তাকার। সুতরাং দেখা তো হবারই কথা’।

মিস ক্লাউডিয়ার মুখে হাসি নয়, গাম্ভীর্য।

‘ঠিক, কিন্তু মানুষ আকাশের কোন গ্রহ বা জ্যোতিস্ক নয়। তাই পৃথিবীতে মানুষের চলার পথ কিন্তু ঠিক বৃত্তাকার নয়।

‘সত্য। কিন্তু চলার পথটা বুনানো কাপড়ের মত এতটাই একে অপরকে স্পর্শ করে আছে যে জীবনের অজস্র মোড়ে দেখা হওয়ার অজস্র সম্ভাবনা’। বলল ক্লাউডিয়া।

‘চলার পথ কিন্তু বুনানো সুতার মত নিয়ম মেনে চলে না’। বলল আহমদ মুসা।

‘এই অনিয়ম আশংকারও তেমনি সম্ভাবনারও। সম্ভাবনার স্বপ্নই মানুষ বেশী দেখে’।

বলেই ক্লাউডিয়া একটা হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল।

গাড়ি নড়ে উঠে চলতে শুরু করল।

সূর্যের আলোতে চারদিক তখন ঝলমল করছে।

যে কোন কারনেই হোক ঘন কুয়াশা আজ নেই।

‘ওরা কি পথে ওৎ পেতে থাকতে পারে? আপনি কি ভাবছেন?’ বলল আমর।

‘ব্ল্যাক ক্রসকে কোন আঘাত না করলে আমরা তাদের টার্গেট হবো না। যেহেতু ওদের টার্গেট ওদের হাতে তাই এই ব্যাপারে কোন ঝামেলায় জড়াতে না হয় সেটাই তারা চাইবে’।

‘ঠিক বলেছেন স্যার, তাহলে এটাই কি ঠিক যে ব্ল্যাক ক্রসই ওমর বায়াকে কিডন্যাপ করেছে? ‘ওকুয়া’রাও তো বিভ্রান্ত করার জন্যে এটা বলতে পারে’।

‘তোমার কথায় যুক্তি আছে আমর। কিন্তু মিঃ ক্লাউডে যেটা বলেছেন, সেটাই সত্য। এখন বিষয়টা পরিষ্কার। যারা ক্লাউডেকে কিডন্যাপ করেছিল, তারাই ওমর বায়াকে কিডন্যাপ করেছে’।

‘বুঝতে পেরেছি জনাব’।

আহমদ মুসা আর কোন কথা বলল না।

ওরা দু’জনও নীরব।

সবারই দৃষ্টি সামনে।

সকালের গাড়ি-বিরল রাস্তা দিয়ে তীব্র বেগে ছুটে চলেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

ডুপ্লের চিঠি পড়া শেষ করে মুখ তুলেই জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা, এ চিঠি তোমরা কবে পেয়েছ?

প্যারিসের ফিলিস্তিন দূতাবাসের বিশাল কক্ষ। একটা বড় টেবিল ঘিরে বসে আছে আহমদ মুসা, ফিলিস্তিনের রাষ্টদুত ফারুক আল আশরাফ এবং দুতাবাসের আরও দু'জন দায়িত্বশীল।

আহমদ মুসা কথা বলছিল ফারুক আল-আশরাফের দিকে লক্ষ্য করে।

'চিঠি গতকাল পেয়েছি জনাব'। বলল ফারুক আল-আশরাফ।

'কিভাবে পেলে?'

'আমাদের ডাক বাক্সে পেয়েছি'।

'আল-হামদুলিল্লাহ। শুরুটা আমাদের ভাল বলতে হবে আশরাফ। তোমার এখানে পৌছার আগেই মিঃ ক্লাউডে'র কাছ থেকে জানলাম ব্ল্যাক ক্রস সম্পর্কে কিছু তথ্য এবং নিশ্চিত হওয়া গেল ব্ল্যাক ক্রসই ওমর বায়াকে কিডন্যাপ করেছে 'ওকুয়া'র পক্ষে। আবার দেখ, তোমার এখানে পৌছেই খোদ ব্ল্যাক ক্রস-এর একজনের কাছ থেকে চিঠি পেলাম'।

'কিন্তু লোকটি তো তার এই পরিচয় দেয়নি'।

'পরিচয় না দেয়াই প্রমাণ করে সে ব্ল্যাক ক্রস-এর লোক। তাছাড়া যে ইনফরমেশন সে দিয়েছে এবং যেখানে দিয়েছে তাও প্রমাণ করে সে ব্ল্যাক ক্রয়-এর লোক'।

ডুপ্লে তার চিঠিতে ওমর বায়াকে যেখানে নিয়ে প্রথমে বন্দী করে রাখা হয় সেখানকার ঠিকানা দিয়েছে এবং জানিয়েছে ওমর বায়াকে প্যারিসেরই অজ্ঞাত কোন একটি জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

'আপনি ঠিক বলেছেন জনাব, একমাত্র ব্ল্যাক ক্রস-এর লোকরাই জানে যে ওমর বায়াকে ফিলিস্তিন দুতাবাসের আশ্রয় থেকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। পত্র

প্রেরক অন্য কেউ হলে ওমর বায়ার খবর ফিলিস্তিন দুতাবাসে পাঠাতো না'। বলল ফারুক আল আশরাফ।

প্যারিসের মানচিত্রের উপর তখন নজর বুলাচ্ছিল আহমদ মুসা।

ডুপ্লের চিঠিতে লিখা রোডটি পাওয়া গেল একদম দক্ষিণ প্যারিসে। এটা প্যারিসের একটা নতুন এলাকা। বিশ বছরের বেশী বয়স নয়।

রাস্তাটির নাম লা ম্যাজারিন। ঠিকানা '৭৭, লা ম্যাজারিন'।

আহমদ মুসা তার কাঠ পেন্সিলের মাথা ঠিকানায় স্থাপন করে বলল, 'চিঠি সত্য হলে এটাই হবে ব্ল্যাক ক্রস-এর একমাত্র ঘাটি যা আমাদের জানার মধ্যে এল। এটাই হবে 'ব্ল্যাক-ক্রস'-এর অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশের আমাদের দরজা'।

একটু থামল আহমদ মুসা।

তারপর আবার শুরু করল, 'কিন্তু ওরা ওখান থেকে ওমর বায়াকে অন্যত্র সরিয়ে নিল কেন?' প্রশ্নটা ছিল আহমদ মুসার স্বগত ধরণের উক্তি।

'মনে হয় আরও নিরাপদ জায়গায় তাকে সরিয়ে নিয়েছে'। বলল আল-আশরাফ।

'কিন্তু ব্ল্যাক ক্রস ওমর বায়াকে প্রথমে কম নিরাপদ স্থানে তুলেছিল এটা যুক্তি বলে না। আমার মনে হয়, কোন কারণে সেখানে নিরাপত্তার অভাব ঘটেছিল। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ হুমকিটা কোত্থেকে এসেছিল তা বলা মুস্কিল। ঐ চিঠি পাঠানো থেকে মনে হচ্ছে, নিরাপত্তার অভাব ভেতরের দিক থেকেই ঘটেছিল'। বলল আহমদ মুসা।

'সেটা কেমন?'

'বলা কঠিন। তবে অবিশ্বস্ততার ঘটনা সেখানে ভেতরে থেকেই ঘটেছে বলে মনে হয়'।

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল রাত ১১টা।

'আশরাফ তুমি একটা ট্যাক্সির ব্যবস্থা করে দাও। আমি লা-ম্যাজারিনে যাব। ব্ল্যাক ক্রস-এর দরজায় নক করে দেখি কিছু পাই কিনা'। আল-আশরাফের দিকে চেয়ে বলল আহমদ মুসা।

'ট্যাক্সি কেন জনাব, এমবেসির সব গাড়ি আপনার'। বলল আল-আশরাফ।

'হ্যাঁ। তোমার এমবেসির গাড়ি নিয়ে গিয়ে পা বাড়াবার আগেই ওদের নজরে পড়ে যাই'।

'ঠিক বলেছেন জনাব। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এই কারণেই তো আমরা এয়ারপোর্টে এমবেসির গাড়ি পাঠাইনি'।

ঘন্টা খানেক পরে আহমদ মুসা ট্যাক্সি করে রাস্তায় নেমে এল। একাই। কাউকে সাথে নিতে রাজী হয়নি। এমবেসি জেদ ধরলে আহমদ মুসা বলেছিল, এ অনিশ্চিত, গোপন ও অনুসন্ধানী অভিযানে একা যাওয়াই নিরাপদ বেশী। এমসেবি আহমদ মুসার কথার উপর কথা বলতে পারেনি। এমবেসেডর আল-আশরাফ সাইমুমের একজন অনিয়মিত ছাত্র-কর্মী ছিল ফিলিস্তিনের বিপ্লবের সময়। তার কাছে আহমদ মুসা পর্বত প্রমাণ উঁচু। তার সাথে সে কথা বলতে পারছে-এই বেশী। আহমদ মুসার কথার উপর কথা বলার তার সাহস আসবে কোত্থেকে। তার উপর ফিলিস্তিনের স্বয়ং প্রেসিডেন্ট টেলিফোনে তাকে বলে দিয়েছে, ফিলিস্তিন এমবেসির সব সম্পদ, সব মানুষ এবং সব শক্তি আহমদ মুসা যে ভাবে চাইবেন সেভাবেই চলবে। সুতরাং আহমদ মুসার সিদ্ধান্তের সাথে আল-আশরাফ একমত হতে না পারলেও আহমদ মুসার কথা সে অবনত শিরে মেনে নিয়েছে।

গাড়ি চলছিল।

আহমদ মুসার চেখে তন্দ্রার ভাব এসেছিল।

গাড়ি থামার ঝাকুনিতে তন্দ্রা ছুটে গেল আহমদ মুসার।

'এসে গেছি জনাব। পাশের বাড়িটাই ষাট নম্বার, এটা গীর্জা। এর আশে-পাশেই আপনার নম্বারটা পেয়ে যাবেন'।

আহমদ মুসা ড্রাইভারকে বাড়ির নম্বার বলেনি। বলেছিল, বাড়ি দেখলেই চিনতে পারব। নম্বারটা ষাট-বাষট্টি ধরনের কিছু হবে।

ভাড়া চুকিয়ে গাড়ি থেকে নামল আহমদ মুসা।

খুজেঁ বের করল ৭৭ নম্বর বাড়ি। বাড়িটি প্রধান রাস্তা থেকে একটু ভেতরে। প্রধান রাস্তা থেকে একটা ছোট্ট রাস্তা গিয়ে বাড়িটির গেটে শেষ হয়েছে।

বাড়িটা তিনতলা এবং বেশ বড়। গেটের দরজা স্টিল শিটের তৈরী।

গেটের পাশে গেটম্যান বক্স নেই। আহমদ মুসা বুঝল গেটটা দুরনিয়ন্ত্রিত। তাহলে কি গেটে ক্যামেরাও থাকতে পারে?

আহমদ মুসা গেট থেকে দুরে একটা বিল্ডিং-এর ছায়ায় আলো-আঁধারির মধ্যে দাড়িয়েঁছিল।

আহমদ মুসা ভাবছিল গেটের এদিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকা যাচ্ছে না। শুরুতেই হাঙ্গামা বাধালে তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। আহমদ মুসার প্রথম কাজ, ওদের সম্পর্কে বিশেষ করে ওমর বায়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ। তারপর ওমর বায়ার খোঁজ পাওয়া গেলে সেখানেই দ্রুত আঘাত হানতে হবে। যাতে শত্রুদের সাবধান হওয়ার আগেই ওমর বায়াকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

এসব চিন্তা করে আহমদ মুসা বাড়ির পেছন দিকে যাবার জন্যে পা তুলতে যাচ্ছিল। এই সময় সেই ছোট রাস্তার উপর আলোর একটা ফ্লাশ জ্বলে উঠল।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। তার বুঝতে বাকি রইল না একটা গাড়ি আসছে, সম্ভবতঃ তার টার্গেট-বাড়িটাই লক্ষেই।

আহমদ মুসার গোটা শরীরে একটা উষ্ণতার আমেজ বয়ে গেল। ব্ল্যাক ক্রসের কেউ কি আসছে? তাহলে সে কি দেকতে পেতে যাচ্ছে ব্ল্যাক ক্রসের কাউকে?

হঠাৎ আহমদ মুসার দেহটা বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার মত যেন ঝাকুনি খেল। এখানে দাড়িয়েঁ থাকলে তো সে এখনি ধরা পড়ে যাবে চারদিকে একবার নজর বুলিয়েই আহমদ মুসা কয়েক গজ সামনের বর্জ ফেলা বাক্সের পেছনে গিয়ে বসে পড়ল।

কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই বর্জ ফেলা বাক্সের সামনেটাসহ গোটা রাস্তা আলোর বন্যায় ভেসে গেল।

দ্রুত একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল সেই গেটের সামনে।

আহমদ মুসা দেখল, ক্যারিয়ার ধরনের গাড়ি। পেছনের ক্যারিয়ারে একটা বড় বাক্স ছাড়া আর কিছু নেই। লোকজন কেউ নেই। বাড়তি লোকজন থাকলে সম্ভবতঃ তারা ড্রাইভারের সাথে সামনের সিটগুলোতে থাকতে পারে।

চট করে আহমদ মুসার মাথায় এল, সে ক্যারিয়ারের পেছনটায় সওয়ার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে।

যেমন চিন্তা তেমনি কাজ।

বর্জ বাক্সটা থেকে ক্যারিয়ারের পেছনের শেষ প্রান্তটা আট দশ গজের বেশী হবে না।

আহমদ মুসা দুই হাতে দু'পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে শরীরটা বাঁকিয়ে পা এবং মাথা এক সমতলে এনে ফুটবলের মত গড়িয়ে চোখের নিমিষে ক্যারিয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর অপেক্ষা করল গাড়ি স্টার্ট নেয়ার।

গাড়িটা গেটের সামনে দাড়িয়েঁ নির্দিষ্ট বিরতিতে তিনবার হর্ণ দিল। তার কয়েক সেকেন্ড পরেই খুলে গেল দরজা।

গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো। নড়ে উঠল গাড়ি।

গাড়ি নড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা একজন এ্যাক্রোব্যাটের মত দেহটাকে কুন্ডলি পাকিয়ে ক্যারিয়ারের তলায় ঝুলে পড়ল এমনভাবে যাতে গেটে ক্যামেরা থাকলেও তা যেন তার নাগাল না পায়।

গাড়ি এসে দাঁড়াল গাড়ি বারান্দায়। আহমদ মুসা শুয়ে পড়ল গাড়ির তলায় গাড়ি বারান্দার উপর।

গাড়ি দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জন গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। একজন বলল, দুবোয়া তুমি এস, ট্রলি ও কয়েকজনকে নিয়ে এসে বাক্সটা নামিয়ে নিয়ে যাবে।

আহমদ মুসা দেখল, জিনস পরা জ্যাকেট গায়ে একজন প্রায় দৌড়ে গিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। লোকটি দরজার গায়ে যে নব তাতে হাত দিতেই দরজা খুলে গেল।

তাহলে এ দরজাও কি স্বয়ংক্রিয়, এ দরজাতেও কি ক্যামেরার পাহারা আছে? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

ইতিমধ্যে গাড়ি থেকে নামা দ্বিতীয় লোকটিও দরজার দিকে এগুলো। সেও গিয়ে দরজার নবে হাত দিলেই দরজা খুলে গেল। সে দরজার পাল্লা টান দিয়ে খুলে রেখে ভেতরে গেল।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, দরজা স্বয়ংক্রিয় নয় এবং তাহলে ক্যামেরার পাহারাও নেই। নিশ্চয় নবের কোন গোপন অংশে কোন সুইচ বা বোতাম আছে। লোকটি ট্রলি নিয়ে আসার জন্যেই দরজা খোলা রেখে গেছে।

আহমদ মুসা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল।

গড়িয়ে সে বেরিয়ে এল গাড়ির তলা থেকে। তারপর স্প্রিং-এর মত উঠে দাড়িঁয়েই ছুট দিল সে দরজার দিকে। ভাবল, ভেতরে ঢোকার এর চেয়ে সুবর্ণ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

কিন্তু দরজায় পা দিয়েই আহমদ মুসা মুখোমুখি হয়ে গেল তিনজন লোকের। একজন ট্রলি ঠেলে নিয়ে আসছিল, আর দু'জন ছিল দু'পাশে।

আহমদ মুসাকে দরজায় দেখে ওরা প্রথমটায় ভুত দেখার মত আঁৎকে উঠল। কিন্তু তার পর মুহুর্তেই দু'জন চোখের নিমিষে বাঘের মত ঝাপিয়েঁ পড়ল আহমদ মুসার উপর।

আহমদ মুসাও ওদেরকে দেখে মুহুর্তের জন্যে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। ওরা ঝাপিয়ে পড়লে আহমদ মুসা চকিতে ডান দিকে একটু সরে ডান দিকে থেকে যে আসছিল তাকে বাঁ হাত দিয়ে ঠেকিয়ে ডান হাত দিয়ে তার কোমরের বেল্ট ধরে হ্যাচকা টানে শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলল বাঁ দিক থেকে আসা লোকটির উপর।

লোকটিকে ছুড়ে দিয়েই মাথা নিচু করে আহমদ মুসা ঝাপিয়ে পড়ল ট্রলি ঠেলে আসা লোকটির উপর। সে রিভলবার তুলেছিল গুলি করার জন্যে।

গুলি সে করল। তার আগেই আহমদ মুসা ঝাপিয়ে পড়েছিল তার উপর। কিন্তু গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে আঘাত করল আহমদ মুসার উপর ঝাপিয়েঁ পড়া দু'জনের একজনকে। ওরা তখন উঠে দাঁড়াচ্ছিল।

আহমদ মুসা ট্রলি সমেত লোকটিকে নিয়ে পড়ে গেল। রিভলবার ছিটকে পড়ে গেল লোকটির হাত থেকে।

লোকটি পড়ে থেকেই তার হাত থেকে ছিটকে পড়া রিভলবার কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল প্রাণপণে। কিন্তু রিভলবারটি আহমদ মুসার নাগালের মধ্যে। সে রিভলবারটি তুলে নিল।

এই সময় দেখল তার উপর ঝাপিয়ে পড়া দ্বিতীয় লোকটি ছুড়ে মারছে একটা ছুরি। রিভলবার তাক করার সময় তখন পার হয়েছে। কোন উপায় না দেখে আহমদ মুসা দেহটা একদিকে বাঁকাতে চেষ্টা করে বাম হাত দিয়ে ধরে ফেলল ছুরিটা। ধরে ফেলল মানে ছুরিটি এসে বিধল আহমদ মুসার বাম হাতের তালুতে।

বেদনায় বিকৃত হয়ে উঠল আহমদ মুসার মুখ। কিন্তু এর মধ্যেই আহমদ মুসার ডান হাতটি বিদ্যুতগতিতে উপরে উঠেছিল এবং নিক্ষিপ্ত গুলী গিয়ে বিদ্ধ হলো ছুরি ছুড়ে মারা লোকটির বুকে।

ঠিক এই সময়েই আহমদ মুসার নিচে পড়ে থাকা লোকটির একটা মুষ্টাঘাত এসে পড়ল আহমদ মুসার ডান হাতে। আহমদ মুসার হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ল। লোকটি রিভলবার তুলে নিল সংগে সংগেই।

কিন্তু আহমদ মুসা তার হাত থেকে রিভলবার ছিটকে পড়ে যাবার সংগে সংগেই বাম হাতের তালু থেকে ছুরিটি খুলে নিয়ে আমুল বসিয়ে দিল লোকটির বুকে।

ছুটে এল ৫জন লোক এই সময় ঘরে। তাদের সকলের হাতেই উদ্যত স্টেনগান।

একজন স্টেনগান তুলেছিল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে। একজন হাত তুলে নিষেধ করে বলল, গুলী খরচ নয়।

আহমদ মুসা ছুরিটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে বাম হাতের আহত তালু চেপে ধরল। ওখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছিল।

যে লোক গুলী করতে নিষেধ করেছিল, সে আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে এসে বলল, আমাদের তিন লোককে খুন করেছিস। কে তুই?

'তিনজন নয় দুইজনকে'। শান্ত কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'আমাকে শিক্ষা দিচ্ছিস। সাংঘাতিক শেয়ানা তো দেখছি'। বলেই সে বিদ্যুতগতির একটা কিক লাগালো আহমদ মুসার কাঁধ এবং পাঁজরের সন্ধিস্থলে।

কাত হয়ে পড়ে গেল আহমদ মুসা।

'একে বেঁধে ফেল আমি আসছি'। বলে লোকটি ভেতরে চলে গেল।

দু'জন এগিয়ে এল। আহমদ মুসা উঠে বসছিল। একজন লাথি দিয়ে আবার ফেলে দিল এবং বলল, 'মরতে এসেছিস শয়তান, গুলীতে মরলে তোর ভালই হতো। বস মনে হয় তোর জন্যে বড় পরিকল্পনা করেছেন'।

আহমদ মুসাকে বেঁধে ফেলল ওরা।

মিনিট পাচেক পরে ফিরে এল লোকটি। লোকটি বার্নেস। ব্ল্যাক ক্রসের এই ঘাটির প্রধান। সে গিয়েছিল ব্ল্যাক ক্রসের প্রধান পিয়েরে পলের সাথে আলোচনা করতে। শুনেই পিয়েরে পল বলেছে, যে দিন ওমর বায়ার চিঠি ধরা পড়ল সেদিনই এ ঘাটি ত্যাগ করা দরকার ছিল। আমাদের ভুল হয়েছে। নির্দেশ দিয়েছে এ ঘাটিঁ এখনই ছেড়ে দিতে। ব্ল্যাক ক্রসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট গোপনীয়তা। পুলিশ তাদের শত্রু না হলেও ফরাসি পুলিশ ব্ল্যাক ক্রস-এর কোন ঘাটি এবং লোককে চেনে না। কোন ঘাটিতে শত্রুর স্বাধীন স্পর্শ পড়লে সে ঘাটি তারা এক মুহুর্ত রাখে না। বার্নেস বন্দী অর্থাৎ আহমদ মুসাকে কি করবে জানতে চেয়েছিল। পিয়েরে বলেছিল, তুমি নানতেজ যাচ্ছ, ওকে নিয়ে যাও। আমাদের বধ্যভুমি হাঙ্গর রাজ্যের ভাল শিকার হবে সে। বার্নেস বলেছিল, তার পরিচয় কি জেনে নেয়া দরকার নয়? পিয়েরে পল বলেছিল, দেখ আমরা কোন গোয়েন্দা সংস্থা নই, এর জন্যে ভিন্ন সংস্থা আছে। আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে আছি। শত্রু সাফ করে এগিয়ে যাওয়া আমাদের কাজ। শত্রুকে যখনই হাতে পাবে, হত্যা কর। এতে ঝুকি কম আছে। গোটা দুনিয়ার ইতিহাস তুমি সামনে আনলে দেখবে, কোন বড় শত্রু ধরা পড়লে তাকে প্রথমেই হত্যা করা না হলে পরে খুব কমই তাদের হত্যা করা গেছে। এভাবে কিংবা সেভাবে তারা ছাড়া পেয়ে গেছে'। পিয়েরে পল আরও উপদেশ দিয়ে বলেছে, ওমর বায়া মনে হয় আমাদের ভোগাবে। তাকে উদ্ধারের মিশন নিয়ে আহমদ মুসা ফ্রান্সে এসেছে। সে একা এলেও তার একটা গ্রুপ নিশ্চয় এখানে এসেছে। আমাদের ঘরে তাকে আমরা ভয় করি না। কিন্তু ঘাটিগুলোকে আরও সাবধান থাকতে হবে।

ঘরে প্রবেশ করেই বার্নেস বলল, শয়তানটাকে আমার গাড়িতে তুলে দাও। ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে তারপর তুলবে গাড়িতে। আমার সাথে যারা যাচ্ছ তারা বাদে সকলে পাশের নতুন ঘাটিতে চলে যাও। লাগেজ পরে সরিয়ে নেয়া হবে।

সংজ্ঞাহীন করে আহমদ মুসাকে গাড়িতে তোলা হলো। বার্নেস এবং ড্রাইভার সামনের সিটে। আহমদ মুসার পাশে উঠে বসল আরেকজন।

গাড়ি বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

ছুটে চলল গাড়ি নানতেজ শহর-অভিমুখে। শহরটি লোরে নদীর মুখে অবস্থিত। নদীটি পশ্চিমে আরও কিছু এগিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে।

তখন রাত ৩টা। ঘুমন্ত প্যারিস নগরী। প্রায় ঘুমন্ত তার রাজপথও।

এরই মাঝে ব্ল্যাক ক্রস-এর গাড়ি সংজ্ঞাহীন আহমদ মুসাকে নিয়ে এগিয়ে চলল রাতের নিঃশব্দ বুক চিরে।

বার্নেস টেলিফোন রাখতেই দরজায় দাঁড়ানো তার মেয়ে লেনা বলে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছ আব্বা?'

'এই একটু ঘুরে আসি'।

'একটু ঘুরে আসার জন্যে বুঝি কেউ জাহাজ সাজায়?

'না মানে শার্ক বে'তে যাব'।

'শার্ক বে'তে কেন আব্বা?' বলে একটু কাছাকাছি সরে এসে বলল, 'আবার হাঙ্গরের কোন খোরক নিয়ে যাচ্ছ আব্বা?'

'লেনা?' বকুনির স্বর বার্নেসের কন্ঠে। পরক্ষণেই স্বরটা নামিয়ে নিয়ে নরম কন্ঠে বলল, 'এ সব বিষয় নিয়ে কোন ভাবনা তোমার ঠিক নয়। তোমার সে বয়স হয়নি'।

লেনা বার্নেসের বড় মেয়ে এবং কলেজের ছাত্রী।

'তোমার কথা ঠিক আব্বা। এসব চিন্তাকে কোন সময়ই আমি ওয়েলকাম করি না। কিন্তু আপনাতেই কানে প্রবেশ করে পীড়া দেয় আব্বা'।

'কান না দিলেই তো হলো'।

'আমার আব্বা জড়িত না থাকলে কান দিতাম না'।

'তুমি বিষয়টাকে যেভাবে দেখছ, বিষয়টা তেমন নয়। অপরাধীকে শাস্তি দেবার বিধান সব যুগেই ছিল'।

'কিন্তু তার আগে তো অপরাধ নির্ধারণের প্রশ্ন আছে'।

'নিরপরাধ কারও গায়ে আমরা হাত দেই না। আজ যে আসামীকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি, সে আমাদের তিনজনকে খুন করেছে।

'আমি যে বিষয় জানি না, তা নিয়ে আমি তর্ক করবো না আব্বা। আমার বক্তব্য শাস্তি দেয়ার নামে হৃদয়হীনতা নিয়ে। অন্ধকার স্বৈরতন্ত্রের যুগে এক সময়

রাজা-সম্রাটরা তাদের প্রতিপক্ষকে বন্যজন্তুর মুখে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখতো। শার্ক বে'তে এই ঘটনাই ঘটছে'।

বার্নেস কোন জবাব দিল না। তার চোখে বিস্ময়। পরে গম্ভীর কন্ঠে বলল, 'এসব কথা তুমি জানলে কোথায় মা?'

'অনেকেই জানে আব্বা'।

'অসম্ভব'।

'অসম্ভব নয় আব্বা। আমি কলেজে একাধিকজনের কাছ থেকে এই কথা শুনেছি'।

'কিন্তু কিভাবে?'

'যারা অপরাধ করে, তারাই অপরাধের কথা ছড়ায় আব্বা। এর কারণ নানা হতে পারে'।

'তুমি একে অপরাধ বলছ?' বার্নেসের কন্ঠে বিরক্তি। অন্য কোন ক্ষেত্রে হলে বার্নেস একথাগুলোর কণামাত্র বরদাশত করতো না। কিন্তু এই মা মরা মেয়েটিকে সে অত্যন্ত ভালবাসে, তার এমন কোন আবদার নেই যা সে পুরণ করে না। এই সুযোগে মেয়েটি তাকে শাসন করতেও শিখেছে। মায়ের মতই চোখ রাখে তার উপর। এতে বার্নেস গর্বিত আনন্দিত। এই কারণেই বার্নেস লেনার কথায় রাগ করতে পারলো না, কিন্তু বিরক্ত বোধ করল ব্ল্যাক ক্রস-এর ব্যাপারে মেয়ে এতদুর জড়িয়ে পড়ায়।

'আইন হাতে তুলে নেবার প্রতিটি ঘটনাই অপরাধ আব্বা, তুমিই প্রথম আমাকে এটা শিখিয়েছ'।

'তুমি ঠিকই বলেছ মা। কিন্তু জাতীয় ব্যাপারে কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে আইন হাতে তুলে নেয়া জাতির জন্যে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়'।

'মাফ কর আব্বা, জাতির যে অধিকার অর্জন করার জন্যে আইন হাতে তুলে নিয়ে বা গোপনে তা অর্জন করতে হয়, সেটা জাতীয় অধিকার নয়। নিশ্চয় কোন গ্রুপ স্বার্থকে জাতীয় অধিকার বলে চালিয়ে দেয়া হয়'।

'মা তুমি বয়সের চেয়েও বড় হয়েছ দেখছি। যাক এসব কথা বাইরে বলাবলি করবে না'। বলে হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল বার্নেস।

লেনা পিতার আরও কাছে সরে এল। মাথা নিচু করে বলল, ‘তোমার না গেলে হয় না আব্বা। তুমি এই কাজে যাও আমার কষ্ট লাগে’।

বার্নেস আবার চেয়ারে বসে পড়ল। মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ‘দশ বছর আগে যদি মায়ের কন্ঠ এভাবে বাধা দিতে পারতো, তাহলে জীবন হয়তো অন্য রকম হতো। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই মা। তুমি এসব ভেবে মন খারাপ করো না। তুমি একে এক ধরনের যুদ্ধ বলে ধরে নাও। তাহলে সান্ত্বনার যুক্তি পাবে’।

‘কিন্তু যুদ্ধ গোপনে হয় না আব্বা। আর যুদ্ধও একটা আইনের অধীন। তার বন্দীদের জন্যে আন্তর্জাতিক আইন আছে’।

‘ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, আরও জ্ঞান ঈশ্বর তোমাকে দিন। আমার মায়ের জন্যে আমার গর্ব হচ্ছে’। বলতে বলতে বার্নেস উঠে দাঁড়াল।

মেয়ের কপালে একটু চুমু দিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটিতে এসে পৌছাল বার্নেস। এখানেই আহমদ মুসাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। এখান থেকেই সবাই গিয়ে উঠবে জাহাজে।

হাত-পা বাঁধা আহমদ মুসাকে বন্দীখানা থেকে বের করে আনা হলো।

বার্নেস দেখল, আহমদ মুসার বামহাত রক্তাক্ত। তালুর ক্ষতস্থানটিতে রক্ত জমাট হয়ে আছে। আরও বুঝল, আহমদ মুসাকে কোন খাবার দেয়া হয়নি। হঠাৎ মনে পড়ল মেয়ে লেনার কথা। মনে পড়ল তার শেষ উক্তিঃ ‘যুদ্ধবন্দীদের জন্যেও আন্তর্জাতিক আইন আছে’। লেনা বন্দীর এই অবস্থা দেখলে নিশ্চয় চিৎকার করে উঠত।

‘বন্দীকে তোমরা খেতে দাওনি?’ সামনে দাঁড়ানো ঘাটির পরিচালককে বার্নেস কতকটা আনমনেই জিজ্ঞাসা করল।

‘এমন বন্দীকে খেতে দেয়ার কোন নিয়ম নেই’। বলল ঘাটির পরিচালক লোকটি।

‘ঠিক আছে। তোমরা খেতে দাও বন্দীকে। আর ওর আহত হাতটা ধুয়ে ওষুধ লাগিয়ে বান্ডেজ করে দাও’। বার্নেসের কন্ঠ নরম।

‘ধন্যবাদ’। বলল আহমদ মুসা বার্নেসকে লক্ষ্য করে।

‘কোন বন্দীর ধন্যবাদ আমরা গ্রহণ করি না’। বলে বার্নেস উঠে দাড়িয়েঁ পাশের কক্ষে চলে গেল।

বার্নেস চলে গেলে ঘাটির পরিচালক স্বগত বলল, ‘স্যারের মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি’।

তারপর পাশে দাঁড়ানো লোকদের নির্দেশ দিল, একে নিয়ে যাও। আর আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলল, নির্দেশ হয়েছে সেবা একটু করতে হবে কিন্তু কোন চালাকি করার চেষ্টা করো না, ফল খুব খারাপ হবে।

রাত ১২টায় সকলে জাহাজে উঠল। জাহাজ ছাড়ার আগে সব ঠিক-ঠাক আছে কিনা চেক করতে গিয়ে বার্নেস নানতেজ ঘাটির পরিচালক ডান্টনকে জিজ্ঞাসা করল, ‘একজন ফাদারকে নিতে বললাম, নিয়েছ?’

‘নিয়েছি। কিন্তু কেন এই বাড়তি ঝামেলা বলুন তো?’

‘হাঙ্গরের মুখে ফেলার আগে লোকটির ব্যাপটাইজ করা হবে। অন্ততঃ মৃত্যুর আগেও ব্যাপটাইজ যদি হয়, তাহলে তার আত্মা শান্তি পাবে’।

‘তার আত্মা শান্তি না পেলে আমাদের কি?’

‘দেখ, আমাদের সবারই মরতে হবে। খৃষ্টের দয়া তো আমাদের সবারই দরকার’।

‘অতীতে কোন সময়ই তো এমনটা করা হয়নি’।

‘হলে ভালই হতো’।

একটু থেমেই আবার বলল বার্নেস, ‘ফাদারকে কি বলে এনেছ? সে আবার ঝামেলা করবে না তো?’

‘একজন প্রফেসনাল ফাদারকে নিয়ে এসেছি। সে টাকা ছাড়া আর কিছু চেনে না’।

‘ধন্যবাদ ডান্টন’।

জাহাজ ছাড়ল। ছুটে চলল লোরে নদীর প্রশান্ত বুক চিরে পশ্চিম দিকে আটলান্টিক মহাসাগরের উদ্দেশ্যে।

জাহাজের লক্ষ্য ‘শার্ক বে’ অর্থাৎ হাঙ্গর সাগর। পূর্ব-উত্তর আটলান্টিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হাঙ্গরের সমাবেশ এখানে। এই কারণেই এর নাম দেয়া

হয়েছে ‘শার্ক বে’। স্থানটি লোরে নদীর মোহনা থেকে পশ্চিমে তিনশ’ মাইল এবং রিলে আইল্যান্ড থেকে দক্ষিণে দু’শ মাইল দুরে অবস্থিত।

এই স্থানটাই ব্ল্যাক ক্রস-এর ‘বিনোদন বধ্যভূমি’। শত্রু বন্দীদের এখানে তারা হাঙ্গরের মুখে ছেড়ে দিয়ে হাঙ্গরদের মানুষ শিকারের মহোৎসব দেখে। ক্রেনে বেঁধে শিকারকে নামিয়ে দেয়া হয় সাগরে। শিকার একবারে হাঙ্গরের মুখে তুলে দেয়া হয় না। হাঙ্গররা একটু একটু করে কেটে নেয়, ছিড়েঁ নেয় মানুষের দেহ। এই দূর্লভ দৃশ্য তারা দেখে মহা উৎসাহে। ব্ল্যাক ক্রস-এর কাছে এর চেয়ে বড় বিনোদন আর নেই।

ভোর চারটার দিকে জাহাজ শার্ক বে’তে গিয়ে পৌছল।

জাহাজের খোলে দরজা জানালাহীন একটা কেবিনে বন্দী ছিল আহমদ মুসা। বাতাস যাওয়া-আসার জন্যে কয়েকটা গবাক্ষ আছে মাত্র। কেবিনটা দরজাহীন এই অর্থে যে, দরজাটা কেবিনের দেয়ালের সাথে মিশে আছে। দূর নিয়ন্ত্রিত দরজাটার নির্মাণ এতই নিখুঁত যে একবার না দেখলে দরজার স্থান চিহ্নিত করা অসম্ভব।

হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, পাও বাঁধা। এমন সেলে বন্দী করে রেখেও তারা নিশ্চিন্ত হয়নি হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছে আহমদ মুসাকে। মিঃ ক্লাউডের কথা মনে পড়ল আহমদ মুসার। তিনি বলেছিলেন বলেছিলেন ব্ল্যাক ক্রস’রা খুবই আত্মবিশ্বাসী। খুব আত্মবিশ্বাসী যারা তারা তো একটু কম সতর্ক হয়। কিন্তু ব্ল্যাক ক্রসকে খুবই সতর্ক দেখা যাচ্ছে। তাকে প্যারিস থেকে আনার সময় হাত-পা বাঁধার পরেও সংজ্ঞাহীন করেছে। তারপর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে তারা সামান্য ঝুকিরও অবকাশ রাখছে না।

মানুষ হিসেবেও ব্ল্যাক ক্রস এর লোকেরা জঘন্য, এ পর্যন্ত এটাই মনে হয়েছে আহমদ মুসার। ব্যতিক্রম শুধু বার্নেস নামক লোকটার আজকের রাতের ব্যবহার। তাকে ব্যান্ডেজ করে দেয়া এবং খেতে দেয়ার আদেশ দেয়া গোটা পরিবেশের সাথে বিদঘুটে মনে হয়েছে।

যাই হোক বার্নেসের কাছে কৃতজ্ঞ সে। হাতের ক্ষতস্থানে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। ব্যান্ডেজ করে দেবার পর অনেকটা ভাল লাগছে।

অন্ধকার সেলের মেঝেয় শুয়ে ভাবছিল আহমদ মুসা। নিজের চেয়ে ওমর বায়ার কথাই তার মনে পড়ছিল বেশী। বেচারার কোনই সন্ধান করা এখনও গেল না। মাঝখানে সেও আটকা পড়ে গেল। তার নিরুদ্দেশ হওয়ার খবর ফিলিস্তিন এমবেসি নিশ্চয় সব জায়গায় জানিয়ে দিয়েছে। প্যারিসে খোঁজও করবে তারা। কিন্তু কিছুই পাবে না। যে ঘাটির সন্ধান এমবেসি জানে, সে ঘাটিতো ব্ল্যাক ক্রস গত রাতেই ছেড়ে দিয়েছে। আহমদ মুসা ভাবল, তার মত করে ওমর বায়াকেও কি ওরা প্যারিসের বাইরে কোথাও নিয়ে গেছে। আহমদ মুসাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা? নানতেজ থেকে তাকে ওরা স্টিমারে তুলেছে। স্টিমারটি নিশ্চয় পশ্চিমে আটলান্টিকের দিকে যাচ্ছে। আটলান্টিকের তীরে কোন শহরে বা ঘাটিতে নিয়ে যাচ্ছে তাকে? না কোন দ্বীপে? আবার মিঃ ক্লাউডের কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন, কোন শত্রুকে হাতে পেলে ব্ল্যাক ক্রস তাকে বাচিয়েঁ রাখে না। একথা ঠিক হলে ব্ল্যাক ক্রস তাকে কোন ঘাটি বা দ্বীপে বন্দী করে রাখতে নিয়ে যাবে, তা ঠিক নয়। তাহলে?

হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল ডোনার কথা। সে ফ্রান্সে আসছে বা এসেছে, একথা ডোনাকে জানানো হয় নি। জানতে পারলে সে নিশ্চয় ভীষণ রাগ করবে অথবা কাঁদবে? ভীষণ জেদি আর দুষ্টু মেয়ে। তেমনি আবার সাহসীও। কাউকে পরোয়া করে কোন কাজ করে না। মনটা কিন্তু তার শিশুর মত সরল। ডোনার দেয়া মানিব্যাগটা এখনও আহমদ মুসার পকেটে। যদি কখনও দেখা হয়, তাহলে তাকে চমকে দেয়া যাবে।

কিন্তু ডোনাকে চমকে দেয়ার কথা ভাবতে গিয়ে আহমদ মুসা নিজেই চমকে উঠল। কেন সে এতদিন এ মানিব্যাগটা বহন করছে? তাসখন্দ থেকে আসার সময় অনেক কিছুই সে ছেড়ে এসেছে, কিন্তু টাকাহীন এ মানিব্যাগটাকে কেন সে পকেটে তুলেছে? কোন উত্তর আহমদ মুসার জোগাল না। তার বদলে হৃদয়ের গভীর কোণ থেকে ভেসে উঠল ডোনার সজল জেদি একটা মুখ। তার সাথে হৃদয়ে গোটা সত্তা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল অব্যক্ত একটা যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণার সাথে পরিচিত আহমদ মুসা। আমিনার বিচ্ছেদ তাকে এ যন্ত্রণাই দেয়। চমকে উঠল আহমদ মুসা।

পায়ের শব্দে চিন্তায় ছেদ পড়ল আহমদ মুসার। পায়ের শব্দ কেবিনের বাইরে। একাধিক লোকের। আহমদ মুসার সেলে আলো জ্বলে উঠল। সেই সাথে খুলে গেল দরজা।

আহমদ মুসা দেখল, বাইরে দাড়িয়েঁ বার্নেস, ডান্টন এবং আরও দু'জন। বার্নেস ছাড়া সকলের হাতে স্টেনগান। বার্নেসের হাতে পিস্তল।

বার্নেস বলল, একজন গিয়ে ওর হাতের বাঁধন খুলে দাও।

হাতের বাঁধন খুলে দিলে আহমদ মুসা উঠে বসল।

'চালাকির কোন চেষ্টা করো না। ব্ল্যাক ক্রস-এর নিশানা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না মনে রেখ'। বলল বার্নেস।

একটু থেমেই আবার শুরু করল, 'তোমার জন্যে খারাপ খবর। খারাপ আর কি, মৃত্যুটা জন্মের মতই স্বাভাবিক। তবে পদ্ধতি একটু বেসুরো এই যা। শোন, এই সমুদ্রে আমাদের একটা বধ্যভুমি আছে। নির্দেশ হয়েছে এই বধ্যভূমিতে তোমাকে ফেলে দেয়ার। ক্ষুধার্ত হাঙ্গরগুলো অনেকদিন হয় মানুষের স্বাদ পায়নি। তোমার এই ছোট্ট দেহে তাদের ক্ষুধার কিছুই হবে না, তবে স্বাদ গ্রহণটা হবে'।

অচঞ্চল চোখে শুনল আহমদ মুসা কথাগুলো। আহমদ মুসার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল তাকে সাগরে নিয়ে আসার রহস্য। মনে মনে শিউরে উঠল ব্ল্যাক ক্রস-এর পশুসুলভ জিঘাংসা দেখে।

বার্নেস কথা শেষ করে একটু থেমেছিল। পরে আবার শুরু করল, 'তুমি বধির নাকি, শুনতে পেয়েছ তোমার মৃত্যুদন্ডের কথা'।

'শুনেছি, বলুন আপনার আর কি বলার আছে'।

'কি ব্যাপার, তোমার ভয় করছে না? তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমার কোন কথাই তুমি বুঝনি'।

'ভয় কেন? ভয় কি কাউকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে?'

বার্নেস বিস্ময়ের সাথে আহমদ মুসার দিকে চাইল। মৃত্যুকে সামনে দেখার পর কি কেউ এভাবে নির্বিকার থাকতে পারে! কি সাংঘাতিক নার্ভ এই লোকটার, ভাবল বার্নেস। আহমদ মুসার কথার উত্তরে বলল সে, 'ভয় কাউকে

মৃত্যু থেকে বাঁচায় না, কিন্তু ভীত মানুষ মাফ চেয়ে, কান্না-কাটি করে অনেক সময় বেঁচে যায়'।

'দেখুন, সব বাঁচাই বাঁচা নয়, সব জীবন জীবন নয়'।

'তোমাকে মনে হচ্ছে দার্শনিক সক্রেটিস কিংবা ধর্মগুরু পোপ। তবে কেন মরতে এসেছিলে আমাদের ঘাটিতে, কেন খুন করলে আমাদের তিনজন মানুষ?'

'খুন করিনি, খুন হয়েছে। সব সময় আক্রমণকারী জেতে না, আক্রান্তও জিততে পারে'।

'মনে হচ্ছে ওরা তোমার বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়েছিল?' মুখ বাকিয়েঁ কথাগুলো বলল বার্নেস। তারপর সাথীদের দিকে ফিরে নির্দেশ দিল, 'একে নিয়ে চল হল রুমে। আর আহমদ মুসার দিকে লক্ষ করে বলল, 'শুনে খুশী হবে, আমরা তোমার ব্যাপটাইজ করব। তোমার আত্মার সদগতি হবে। মনে শান্তি পাবে'।

আহমদ মুসার ঠোটেঁ হাসি ফুটে উঠল। কিছুই বলল না।

'এরপরও হাসছিস, তোর মাথা খারাপ নাকি?'- বলে ডান্টন আহমদ মুসাকে পা ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল হল রুমের দিকে।

হল ঘর ভর্তি লোক। জাহাজের পাচক-বয়-বেয়ারা থেকে শুরু করে সবাই এসেছে ব্যাপটাইজ দেখতে। ঘরের একপ্রান্তে একটা বেদি। সেখানে বসেছেন একজন ফাদার। তার গলায় ঝুলছে একটা সোনালী ক্রস।

আহমদ মুসাকে তার সামনে নিয়ে রাখা হলো। তার পা তখনও বাঁধা।

'ওর পা খুলে দিন। মুক্ত মানুষ না হলে ব্যাপটাইজ হয় না'।

হল ঘরের অন্য তিনদিক ঘিরে দাড়িয়েঁ আছে ব্ল্যাক ক্রস-এর লোক। তাদের প্রত্যেকের হাতে ঝুলছে স্টেনগান। তাদের পেছনে অন্যান্য লোক। আহমদ মুসার কাছে বেদির পাশে আরেকজন দাড়িয়ে। তার হাতের স্টেনগান আহমদ মুসার দিকে তাক করা।

বার্নেসের নির্দেশে একজন এসে আহমদ মুসার পায়ের বাঁধা খুলে দিল।

বার্নেস আর ডান্টন দাড়িয়েছিল ঘরের মাঝখানে। তাদের হাতে রিভলবার।

বাঁধ খুলে দেয়ার পর আহমদ মুসা দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসল।

ফাদারও একটু নড়ে-চড়ে বসে বাইবেল হাতে নিয়ে আহমদ মুসার দিকে লক্ষ্য করে বলল, 'একটু এগিয়ে এস বৎস'।

আহমদ মুসা মুখ তুলে চাইল ফাদারের দিকে।

মাত্র গজ খানেক দুরে বেদির পাশে দাঁড়ানো স্টেনগান ধারীর দিকেও তার নজর পড়ল। তার স্টেনগানের ব্যারেল ১২০ ডিগ্রী এ্যাংগেলে উপরে উঠানো।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল ফাদারের দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু দু'পা এগিয়েই ঝাপিয়ে পড়ল স্টেনগানধারীর উপর।

বাম হাত দিয়ে তার স্টেনগান কেড়ে নিয়ে ডান হাত দিয়ে একই সাথে তার কানের নিচে একটা কারাত চালাল। তারপর স্টেনগানের ট্রিগার চেপে ধরেই ঘুরে দাড়াল আহমদ মুসা এবং চোখের নিমেষে স্টেনগানের ব্যারেল ঘুরিয়ে নিল গোটা ঘরে।

বার্নেস এবং ডান্টন আহমদ মুসার উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল সে স্টেনগান কেড়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু তারা গুলী বৃষ্টির মুখে পড়ে গিয়েছিল। ঝাঁঝরা হয়ে গেল তাদের দেহ।

ঘরের চারদিকে যারা দাড়িয়েঁছিল, তারা সবাই মেঝেয় লুটোপুটি খাচ্ছে। রক্তে ভাসছে তারা।

ব্ল্যাক ক্রস-এর লোকরা সবাই সামনেই দাড়িয়েছিল। তারা কেউ বেচে নেই বলেই আহমদ মুসার মনে হলো।

ফাদার ভয়ে যেন পাথর হয়ে গেছে। তার মুখ কাগজের মত সাদা। সে হাত দিয়ে বাইবেল তুলেছিল। বাইবেল ধরেই বসে আছে।

আহমদ মুসা তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আপনার কোন ভয় নেই। আপনি উঠুন। মৃত ও আহতদের আলাদা করুন'।

তারপর আহমদ মুসা ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, যারা বেচে আছ তারা উঠে দাড়াও। দেরী করলে আবার গুলী চালাব।

আহমদ মুসা কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই পাচজন লোক উঠে দাড়াল। এবং সমস্বরে বলল, আমরা জাহাজে ছোট চাকুরী করি। আমাদের কোন দোষ নেই।

আহমদ মুসা তাদের একজনকে ডেকে বলল, 'তুমি ব্ল্যাক ক্রস-এর সংজ্ঞাহারা এই লোকটাকে বেধে ফেল। আর তোমরা ফাদারের সাথে ওদের পরীক্ষা করে দেখ। আহতদের আলাদা কর এবং সমস্ত অস্ত্র এনে ঘরের মাঝখানে জড়ো কর'।

আহত পাওয়া গেল চারজনকে। মৃত দশজন।

'জাহাজে আর কেউ আছে?' ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'মাষ্টার সারেং আছেন'। একজন জবাব দিল।

'ওকে ডাক'। বলল আহমদ মুসা।

সঙ্গে সঙ্গেই একজন গিয়ে ডেকে আনল।

'মাষ্টার সারেং পঞ্চাশোর্ধ বয়সের। কাঁপতে কাঁপতে সে এসে প্রবেশ করল।

'আপনি এঘরে আসেননি যে?' তাকে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'এসব দেখতে আমার ভাল লাগে না'।কাঁপা গলায় সে বলল।

'কোন সব দেখতে ভাল লাগে না'।

'খুনোখুনি, হাঙ্গরের মুখে মানুষ ফেলা ইত্যাদি।

'কত বছর চাকুরী করেন এখানে'।

'পাঁচ বছর'।

'ভাল না লাগলে এতদিন কেউ থাকে?'

'ইচ্ছা করলেই কেউ এখান থেকে চাকুরী ছাড়তে পারে না। কান্না জড়ানো সুরে বলল সারেং।

'তোমাদের কেউ একজন গিয়ে জাহাজের 'মেডিকেল কিট' নিয়ে এস।

যে লোকটি সারেংকে ডাকতে গিয়েছিল সেই ছুটে গেল।

'মেডিকেল কিট' নিয়ে এলে আহমদ মুসা ওদের নির্দেশ দিল আহতদের ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে।

ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হলে আহমদ মুসা সারেংকে বলল আহত ও ফাদারসহ সবাইকে বেঁধে ফেলতে। বলল, 'আমি ভয় করছি না, কিন্তু কোন ঝুকিঁ নিতে চাই না'।

তারপর অস্ত্রগুলো সাগরে ফেলে দিয়ে এবং সবাইকে হল ঘরে রেখে হল ঘর বন্ধ করে দিল। শুধু একটা রিভলবার এবং একটা স্টেনগান নিজের কাছে রাখল। রিভলবার পকেটে ফেলে স্টেনগানটি হাতে নিয়ে সারেংকে বলল, 'চলুন জাহাজ স্টার্ট দেবেন'।

জাহাজ স্টার্ট নিলে আহমদ মুসা সারেংকে কনট্রোল চেয়ারে বসিয়ে নিজে তার পেছনে চেয়ার নিয়ে বসল।

জাহাজ চলতে শুরু করল।

'হাঙ্গরের এই বধ্যভূমিতে ওরা কত মানুষকে খুন করেছে?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'আমার চাকুরীকালে শ'খানেক হবে'।

'আমি কে, আমাকে কেন ওরা খুন করতে চেয়েছিল জানেন আপনি'।

'কোন সময়ই আমাদের কিছু জানানো হয় না'।

'ব্ল্যাক ক্রস-এর চীফ কে, এদের হেড কোয়ার্টার কোথায় জানেন?'

'বলেছি জনাব, আমাদের কিছুই জানতে দেয়া হয় না'।

'জানলেও আপনি বলতে পারবেন না। জিজ্ঞাসা করাই ভুল হয়েছে'।

'ভুল বুঝবেন না জনাব, আমরা এখানে ক্রীতদাস শ্রমিকের মত। এই জাহাজের বাইরে আমরা কিছুই চিনি না। ছুটি পেলে চোখ বন্ধ করে বাড়ি যাই এবং চোখ বন্ধ করে বাড়ি থেকে ফিরে আসি। কোন জাহাজে চাকুরী করি, তাও কাউকে বলতে পানি না'।

বেলা ৮টার দিকে লোরে নদীর মোহনায় এসে পৌছাল জাহাজ।

'জাহাজ নানতেজে নেব, না সেন্ট নুজায়েরে নোঙ্গর করব?' জিজ্ঞাসা করল সারেং।

'নানতেজ পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সেন্ট নুজায়েরে নোঙ্গর করুন'।

জাহাজ নোঙ্গর করার পর আহমদ মুসা সারেংকে বেঁধে ফেলল। বলল, আপনাকে বেঁধে রাখা আপনার জন্যেই প্রয়োজন। এতে ওরা বুঝবে আপনি আমাকে কোন সাহায্য করেননি।

কেবিন থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে আহমদ মুসা পা বাড়ালে সারেং বলল, 'আপনি কে জানি না। কিন্তু শত্রু এমনও হতে পারে, তা আপনাকে না দেখলে কোনদিনই জানতাম না। আপনার জীবনের চরম বৈরী আহত শত্রুর আপনি চিকিৎসা-শুশ্রুসার ব্যবস্থা করেছেন। এমন শত্রুর কথা আমার কাছে অকল্পনীয়। আপনি বিদেশী। বলবেন কি, আপনি কে?'

আহমদ মুসা না ফিরেই বলল, 'আমি আহমদ মুসা'। বলে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল সে।

সেন্ট নুজায়ের ছোট্ট সমুদ্র শহর। লোরে নদীর শেষ প্রান্তে অবস্থিত।

এ শহর থেকে বাইরে যাবার একটাই পথ। সে পথটা সেন্ট নুজায়ের থেকে নানতেজ গেছে।

আহমদ মুসা নানতেজ যাওয়াই স্থির করল।

নানতেজ ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটি সে দেখেছে। সেখানে গিয়ে সামনে এগুবার কোন পথ পাওয়া যায় কিনা তা দেখতে হবে।

জুতার শুকতলির নিচ থেকে ২'শ ডলারের একটা নোট বের করে তা ভাঙিয়ে আহমদ মুসা ট্যাক্সিতে করে নানতেজ যাত্রা করল।

সেন্ট নুজায়ের থেকে নানতেজ মাত্র একশ' কিলোমিটার। নয়টার মধ্যেই আহমদ মুসা পৌছে গেল নানতেজ।

নানতেজের ব্ল্যাক ক্রস-এর যে ঘাটি আহমদ মুসা চেনে তা নানতেজ বন্দরের কাছাকাছি।

আহমদ মুসা সোয়া ৯টার দিকে ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটিতে পৌছাল।

ঘাটি সুন্দর দোতলা একটা বাড়ি। একটাই মাত্র গেট। গেটে ভারি দরজা।

আহমদ মুসা গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে বলল, 'আমি কি আপনাকে ভাড়া মিটিয়ে দেব, না আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন?'

'কতক্ষণ দেরী হবে আপনার?'

'বলতে পারি না। পনের-বিশ মিনিট দেরী হতে পারে, আমার নাও ফিরতে পারি'।

'আপনি সুন্দর কথা বলেন তো! বুঝা যাচ্ছে, আপনি বাড়িটাতে গিয়ে বিপদে পড়তে পারেন। যাতে এমনকি আপনার জীবনও যেতে পারে। এই তো?'

'হতে পারে'।

'তাহলে আমি অপেক্ষা করব। আপনি বিদেশী। শেষ না দেখে আমি যেতে পারছি না'।

'ধন্যবাদ। একটা কাজ করি, আমার কাছে চৌদ্দশ ফ্রাঙ্ক আছে। আপনার কাছে জমা রেখে যাই। ফিরে এলে পেয়ে যাব, না ফিরে এলে আপনি চলে যাবেন, তাতে টাকাগুলো শত্রুর হাতে পড়ল না'।

'আমি যদি টাকা নিয়ে পালিয়ে যাই?'

'আপনার কিছু উপকার হলে তাতে আমার মন খারাপ হবে না'।

'আপনি আশ্চর্য মানুষ তো?'

আহমদ মুসা কোন জবাব না দিয়ে বাড়িটার দিকে পা বাড়াল।

ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটির দিকে যেতে যেতে আহমদ মুসা ভাবল, ঘাটির পরিচালক ডান্টন নেই। নিশ্চয় আরও দু'চারজন এখান থেকে গেছে ডান্টনের সাথে। সুতরাং ঘাটিতে খুব বেশী লোক থাকার কথা নয়। আহমদ মুসার লক্ষ্য হলো, বাড়িটা সার্চ করা, ব্ল্যাক ক্রস-এর কোন তথ্য, দলিল দস্তাবেজ পাওয়া যায় কিনা তা দেখা।

আহমদ মুসা গিয়ে সরাসরি গেটে নক করল। শত্রুর উপর জয়ী হবার এটাও একটা বড় কৌশল। কেউ সাধারণত মনে করে না যে, তার কোন শত্রু এভাবে দরজা নক করে আসবে। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অপ্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া যায়।

কয়েকবার নক করার পরেও ভেতর থেকে কোন জবাব এল না।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে দরজার উপর চাপ দিল। খুলে গেল দরজা। বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কয়েক ধাপ সামনে এগিয়ে যাবার পর আহমদ মুসার বুকটা হঠাৎ ছ্যাৎ করে উঠল। কোন ফাঁদ নয় তো?

সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা পকেট থেকে রিভলবারটা তুলে নিল হাতে।

আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে করিডোরের মুখে গিয়ে পৌছল সে।

পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। ঘুরেই দেখল, লোহার একটা বিরাট রড তার মাথা লক্ষ্যে নেমে আসছে।

আহমদ মুসা মাথাটা দ্রুত সরিয়ে নিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। রডটি কপালের বাম পাশের বেশ খানিকটা চামড়া খুলে নিয়ে প্রচন্ড বেগে আহমদ মুসার ডান হাতে গিয়ে আঘাত করল। হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রিভলবারটি।

আহমদ মুসা দেহের ভারসাম্য রাখতে পারল না। পড়ে গেল। পড়ে গিয়েই দেখল, দ্বিতীয়জনের আর একটি রড নেমে আসছে আবার তার মাথা লক্ষ্যে।

আহমদ মুসা দ্রুত গড়িয়ে নিজেকে সরিয়ে নিল। রডটা গিয়ে আঘাত করল পাথরের মেঝেতে। আগুন জ্বলে উঠল প্রবল ঘর্ষণে।

লোকটি তার রডটি পুনরায় হাতে তুলে নেবার আগে রডের নিচের মাথাটা ধরে ফেলল আহমদ মুসা এবং শুয়ে থেকেই হ্যাচকা টানে কেড়ে নিল রডটি। লোকটি ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর।

আহমদ মুসা উঠে দাড়াল বিদ্যুতগতিতে। প্রথম লোকটি আবার রড তুলেছিল মারার জন্য। আহমদ মুসা হাতের রড দিয়ে তার ছুটে আসার রডের আঘাত ঠেকিয়ে দিয়ে সংগে সংগেই ডান পায়ের একটা লাথি চালাল তার তলপেটে। তলপেট ধরে পড়ে গেল লোকটি।

তৃতীয় লোকটি রিভলবার বের করেছিল, আর অন্যদিকে যার হাত থেকে রড সে কেড়ে নিয়েছিল, সেও উঠে দাড়াচ্ছিল।

কিন্তু আহমদ মুসা ওদের সময় দিল না। আহমদ মুসা হাতের রড চালাল রিভলবার তুলে নেয়া হাতের উপর। সাপ মারার মতো আরও কয়েকবার রড চালাল তার উপর। রিভলবার তার আগেই হাত থেকে ছিটকে পড়েছিল। সেও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কিন্তু সময় পেয়ে গিয়েছিল উঠে দাড়ানো লোকটি। সে ঝাপিয়ে পড়ল আহমদ মুসার উপর। আহমদ মুসা পড়ে গেল এবং সেই সাথে সে লোকটাও।

দু'জনে লুটোপুটি, ধ্বস্তা-ধ্বস্তি চলল কিছুক্ষণ। লোকটি হাতের কাছে রিভলবার পেয়ে গেল। কিন্তু আহমদ মুসা তার রিভলবার ধরা দু'হাত তার দিকেই ঘুরিয়ে দিল। চার হাতের চাপা-চাপিতে ফায়ার হলো রিভলবার থেকে। কানের পাশ দিয়ে গুলী ঢুকে গেল লোকটির মাথায়।

রিভলবার নিয়ে উঠে দাড়াল আহমদ মুসা।

পেটে লাথি খাওয়া লোকটি উঠে দাড়াচ্ছিল টলতে টলতে।

আহমদ মুসা রিভলবার বাম হাতে নিয়ে ডান হাতের প্রচন্ড একটা কারাত চালাল লোকটির ঘাড়ে।

লোকটি অর্ধেক পর্যন্ত উঠে দাড়িয়েছিল। আবার লুটিয়ে পড়ল জ্ঞান হারিয়ে।

আহমদ মুসা পড়ে থাকা দ্বিতীয় রিভলবারটি পকেটে পুরে, আরেকটি রিভলবার হাতে নিয়ে এগুলো ঘরগুলো অনুসন্ধান করে দেখার জন্যে।

বাড়িতে সব মিলিয়ে ১২টা ঘর। কোন ঘরেই কিছু পেল না আহমদ মুসা। এক টুকরো কাগজও কোথাও নেই। কোন কাপড়-চোপড়ও নেই। তবে অন্য সবকিছু ঠিক আছে। টেলিফোনও আছে, কিন্তু টেলিফোন গাইড নেই এবং টেলিফোনের সেটে যে নাম্বার কোর্ড থাকে তাও নেই। অর্থাৎ ব্ল্যাক ক্রস পরিকল্পিত ভাবেই এ ঘাটি পরিত্যাগ করেছে। কেন? জাহাজের সব খবর তাহলে এখানে পৌছেছে কি? প্যারিসের যে ঘাটিতে আহমদ মুসা প্রবেশ করেছিল, সে ঘাটিও ব্ল্যাক ক্রস ছেড়ে দেয়। বুঝা যাচ্ছে, শত্রুরা তাদের কোন ঘাটি চিনে ফেললে সে ঘাটি আর তারা রাখে না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, জাহাজের খবর এত তাড়াতাড়ি এখানে পৌছাল কি করে?

নিশ্চয় জাহাজের লোকেরা ছাড়া পেয়েছে। তারাই এখানে খবর পৌছিয়েছে টেলিফোনে। তারপরই ঘাটি ছেড়ে দেয়া হয় এবং ফাঁদ পেতে রাখা হয় তাকে ধরার জন্যে। ভাবল আহমদ মুসা।

কিন্তু একটা বিষয় বুঝতে পারল না সে, তাকে এত বড় শত্রু মনে করল কি করে! তাহলে কি তাকে খুব বড় শত্রু বলে তারা মনে করেছে, যে শত্রু প্রতিশোধ নেবার জন্যে ঘাটিতেও হানা দিতে পারে? কিন্তু কেন তা মনে করবে? জাহাজের ঘটনার পর কি তাদের ধারণা পাল্টে গেছে?

টেলিফোন বেড়ে উঠল।

টেলিফোনের রিসিভার উঠাল আহমদ মুসা।

'হ্যালো, আমি লেনা'। ও প্রান্ত থেকে এক নারী কন্ঠের এই আওয়াজ শুনতে পেল আহমদ মুসা। কন্ঠকে একটা কিশোরীর বলে মনে হলো আহমদ মুসার কাছে।

'কি চাও, কাকে চাও তুমি?' জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

সম্ভবতঃ আহমদ মুসার কথা শুনে ও প্রান্তের মেয়েটা একটু দ্বিধা করল। কথা বলল না কয়েক মুহুর্ত। একটু সময় পরে বলল, 'আপনাকে মনে হচ্ছে বিদেশী। আপনি কি ওখানকার কেউ নন?'

'হ্যা বিদেশী। কেউ নই এখানকার'।

'কোথায় ওরা? ওদের কাউকে দিন'।

'কেউ নেই ওরা। সবাই চলে গেছে'।

'সবাই তো যেতে পারে না'।

'ওরা এ বাড়ি পরিত্যাগ করেছে'।

'বাড়ি পরিত্যাগ করে...' কথা শেষ করতে পারল না মেয়েটি। কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল তার।

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা। হঠাৎ ভাবল, মেয়েটি কি এ ঘাটির কারও কেউ হবে? জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কে বোন? তুমি কি জানতে চাও। বল, আমি তো আছি'।

'আমি বার্নেসের মেয়ে। আমার আব্বা ফিরেছেন কিনা বলতে পারেন? মনটা খুব অস্থির লাগছে আব্বার জন্যে'।

আহমদ মুসার বুকটা ধক করে উঠল। এ কোন বার্নেসের মেয়ে! যে বার্নেসকে সে জাহাজে হত্যা করেছে সেই বার্নেসের মেয়ে? বুক থর থর করে কেঁপে উঠল আহমদ মুসার। নিশ্চিত হবার জন্যেই আহমদ মুসা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার আব্বা কোথায় গেছেন? কখন ফেরার কথা বোন?' নরম কন্ঠ আহমদ মুসার।

'শার্ক বে'র দিকে গেছেন। এতক্ষণ ফেরার কথা'।

আহমদ মুসার আর কোন সন্দেহ রইল না, সেই বার্নেসের মেয়েই এই লেনা।

নিশ্চিত হবার সাথে সাথেই বেদনার কালো আঁধারে ছেয়ে গেল তার গোটা হৃদয়টা। মুহুর্তের জন্যে বাকহারা হয়ে গেল আহমদ মুসা। শুনতে পাচ্ছে, ওপার থেকে মেয়েটি হ্যালো, হ্যালো বলে চিৎকার কর চলেছে।

কিন্তু কি জবাব দেবে সে পিতার প্রতীক্ষমান এই মেয়েকে! কেমন করে বলবে যে তার পিতা নিহত। কেমন করে বলবে যে তার হাতেই তার পিতা নিহত হয়েছে!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় আহমদ মুসা মুহুর্তের জন্যে সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল। আর শিথিল হাত রিসিভার সমেত নেমে এসেছিল।

সম্বিত ফিরে পেয়েই রিসিভার কানে তুলল আহমদ মুসা। শুনতে পেল টেলিফোন একটানা পিপ পিপ শব্দ। লাইন কেটে গেছে। চিৎকার করে করে অস্থির, উদ্বিগ্ন মেয়েটি টেলিফোন রেখে দিয়েছে।

ওপারের একটা দৃশ্য ফুটে উঠল আহমদ মুসার চোখে। টেলিফোন রেখে দিয়ে নিশ্চয় চিৎকার করে জড়িয়ে ধরেছে মাকে অথবা বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কাদছে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার তীব্র বেদনায়।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে রিসিভারটি রেখে দিল। দু'চোখ থেকে দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তার।

চোখ মুছল আহমদ মুসা।

চোখ মুছতে গিয়ে আঙুলে রক্ত লাগল।

এতক্ষণে তার মনে পড়ল কপালের ডান পাশটা তার থেতলে যাবার কথা।

মুখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে আসা রক্ত রুমাল দিয়ে মুছে ফেলল। কপালের ক্ষতে রুমাল ঠেকাতে গিয়ে বেদনায় কেপে উঠল শরীরটা।

এতক্ষণে লক্ষ্য করলো তার জ্যাকেটের উপরও রক্ত গড়িয়ে পড়েছে। তাছাড়া বাম হাতের তালুর ক্ষত থেকেও রক্ত ঝরছে।

আহমদ মুসা বেরিয়ে এল ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটি থেকে।

দেখল ট্যাক্সি ঠিক জায়গায় দাড়িয়ে আছে।

আহমদ মুসা কাছে যেতেই গাড়ির ড্রাইভার বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। আহমদ মুসার সর্বাঙ্গে নজর বুলিয়ে বলল, 'ইস কপালটা থেতলে গেছে, আপনি ভাল আছেন তো? আমার কাছে ফাস্ট এইড বক্স আছে। ব্যান্ডেজ করে দেব?'

'ধন্যবাদ' বলে আহমদ মুসা গাড়িতে উঠে বসতে বসতে বলল, 'ফাস্ট এইড বক্সটা আমাকে দাও। আর গাড়ি স্টার্ট দাও তুমি'।

'ফাস্ট এইড বক্স আহমদ মুসার হাতে তুলে দিয়ে ড্রাইভিং সিটে নড়ে-চড়ে বসে ড্রাইভার বলল, কোথায় যাব স্যার?'

প্রশ্ন শুনে আহমদ মুসার মনেও প্রশ্ন জাগল, এখন কোথায় যাবে সে? ব্ল্যাক ক্রস-এর সন্ধান পাবার সকল সুত্রই সে আবার হারিয়ে ফেলেছে। এখন কোথায় খুজবে তাদের, কোথায় খুজে পাবে ওমর বায়াকে। প্যারিসেই কি আবার ফিরবে সে?

মনস্থির করে আহমদ মুসা বলল, 'প্যারিসের পথ কোনটা তুমি ভাল মনে কর?'

‘অনেক পথ আছে। তবে এ্যানজার, তুরস ও অরিয়েনস হয়ে যে রাস্তা প্যারিস গেছে, সেটাই সবচেয়ে ভাল রাস্তা। অর্ধেকটা পথ লোরে নদীর পাশাপাশি যাওয়া যাবে। পথে পাহাড়, বন, গ্রাম প্রভৃতি সব ধরণের দৃশ্যই চোখে পড়বে।

গাড়ি স্টার্ট দেবার আগে ড্রাইভার আহমদ মুসার দেয়া ১৪শ’ ফ্রাংক আহমদ মুসার দিকে তুলে ধরে বলল, ‘আপনার টাকা নিন স্যার’।

‘ঠিক আছে তুমি রাখ’। গন্তব্যে পৌছে তোমার ভাড়া রেখে আমাকে দিয়ে দেবে’।

‘আপনি রাখলেও সেটাই হবে। পৌছে আমার ভাড়াটা দিয়ে দেবেন’।

আহমদ মুসা টাকা রাখল।

গাড়ি চলতে শুরু করল।

বেলা ১২টার দিকে আহমদ মুসার গাড়ি লোরে নদীর পশ্চিম পাশে তুরেন উপত্যকা পার হয়ে তুরস শহরের সন্নিকটবর্তী সুর লোরে পাহাড়ী এলাকায় প্রবেশ করল। ‘সুর লোরে’ পশ্চিম ফ্রান্সের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র। পরিকল্পিত সবুজ বনে আচ্ছাদিত পাহাড়গুলো। এই পাহাড় অঞ্চলের মধ্যে একে-বেকে এগিয়ে গেছে হাইওয়েটি তুরস শহরের দিকে।

আহমদ মুসা ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছিল।

আহমদ মুসা ‘সুর লোরে’তে প্রবেশের আগেই লক্ষ্য করছিল একটা গাড়ি তার গাড়ির সমান স্পীডে এগিয়ে আসছে অনেকক্ষণ ধরে একই গতিতে।

কিন্তু ‘সুর লোরে’ এলাকায় প্রবেশের পর গাড়িটা দ্রুত কাছাকাছি চলে এল এবং বার কয়েক হর্ণ দিল। তার পরপরই আহমদ মুসার গাড়িও হর্ণ দিয়ে উঠল। পেছনের হর্ণ শুনে আহমদ মুসার মনে হয়েছিল, গাড়িটা ওভারটেক করার জন্যে রাস্তার ভিন্ন চ্যানেলে চলে যেতে চায়। কিন্তু গাড়িটির গতিতে ওভারটেক করার কোন লক্ষণই দেখতে পেল না। তারপরও তার গাড়ির হর্ণ শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। দুই গাড়ির হর্ণ একই মাপের একই টোনের। শুনেই আহমদ মুসার মনে হল তার গাড়ির হর্ণ পেছনের গাড়ির হর্ণের জবাব দিয়েছে। কিন্তু এটা তো স্বাভাবিক নয়। ট্রাফিক নিয়ম পেছনের গাড়ির ওভার টেকের সাথে তার পেছনের গাড়ির সম্পর্ক, সামনের গাড়ির নয়।

অল্প কিছুক্ষণ পর পেছনের গাড়িটি শটওয়েভ ভংগীতে এক নাগাড়ে কয়েকটি হর্ণ বাজাল।

আহমদ মুসা তাকাল ড্রাইভারের দিকে। দেখল, তার মুখটা বিষন্ন হয়ে উঠেছে এবং লক্ষ্য করল, ড্রাইভারের আঙুল হর্ণ-সুইচে কয়েকবার উঠানামা করল। এবারও হর্ণ বাজাল পেছনের গাড়ির মত করেই।

এবার আহমদ মুসার বিস্ময় সন্দেহে রুপান্তরিত হলো। এ দু'টি গাড়ির মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে? কিংবা দু'টি গাড়ি কি কোন একই গ্রুপের? সে গ্রুপটি কি? হঠাৎ আহমদ মুসার মনে পড়ল। সেদিন রাতে প্যারিসে ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটির গেটে ব্ল্যাক ক্রস-এর ক্যারিয়ারকে সে এই একই মাপ ও টোনে হর্ণ দিতে শুনেছিল।

আহমদ মুসার গোটা শরীরে একটা উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল। তাহলে কি এ দু'টি গাড়ি তার সন্ধান পেল কি করে? এই গাড়ি কি তার সন্ধান দিয়েছে? কিন্তু এ ড্রাইভার জানবে কি করে যে আমি কে? নানতেজে ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটিতে ঢুকেছিলাম, তাদের সাথে লড়াই হয়েছে-এ থেকেই কি? কিন্তু ড্রাইভার ব্ল্যাক ক্রস-এর লোক হলে ঐ ঘাটিতে তার কোন ভূমিকা ছিল না কেন?

আহমদ মুসা বিপরীত মুখী চিন্তায় জড়িয়ে পড়ল। কোন সমাধান খুজে পেল না।

এই সময় ড্রাইভার বিষন্ন মুখে মুহুর্তের জন্যে আহমদ মুসার দিকে মুখ ফিরাল এবং বলল, 'স্যার আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?' ড্রাইভারের কন্ঠে উদ্বেগ।

'অবশ্যই'। আহমদ মুসার চোখে-মুখে প্রবল উৎসুক্য।

'স্যার ব্ল্যাক ক্রস কি আপনার শত্রু?'

'এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছ কেন?' আহমদ মুসার চোখ-মুখ শক্ত হয়েছে। তার কন্ঠও খুব কাটখোট্টা শুনাল।

'ব্ল্যাক ক্রস এর গাড়ি এই গাড়িকে ফলো করছে?'

'কি করে জানলে তুমি?'

'ওরা সিগন্যাল দিয়েছে'।

'কি সিগন্যাল দিয়েছে?'

'ওরা হাইওয়ে থেকে পাশে কোথাও নেমে যেতে বলেছে'।

'তুমি কে?'

'আমি ব্ল্যাক ক্রস-এর অনিয়মিত বাহিনীর একজন কর্মী। কিন্তু এই মুহুর্তে আমি আপনার নিয়োজিত একজন ড্রাইভার'।

'আমি নানতোজ ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটিতে যখন ঢুকলাম তখন এবং তারপরেও তো তুমি কিছু বলোনি?'

'ওটা ব্ল্যাক ক্রস-এর ঘাটি ছিল আমি জানি না। শুধু ওদের আদেশ পালন ছাড়া ওদের কোন কিছুই আমরা অনিয়মিতরা জানি না'।

ড্রাইভার একটা ঢোক গিলল। তারপর আবার শুরু করল, স্যার ওরা আপনাকে খুন করবে। ওদের হাত থেকে কেউ বাচে না। স্যার আমাকে একটা আঘাত করে অজ্ঞান করে, রাস্তায় ফেলে দিয়ে আপনি গাড়ি নিয়ে চলে যান। চেষ্টা করুন বাচার'।

'তুমি কেন আমাকে সাহায্য করবে?' আহমদ মুসার কন্ঠে বিস্ময়।

'আপনি বিদেশী। আপনাকে কোন অপরাধী বলে আমার মনে হয়নি। তাছাড়া আমার একমাত্র ছেলে হাসপাতালে এখন মুমূর্ষু। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন। আমি কোন খুনোখুনির মধ্যে যেতে পারবো না'।

'আমি তোমাকে আঘাত করতে পারবো না। এই চলন্ত গাড়ি থেকে ফেলে দিলে তুমি মারাত্মক আহত হবে।

'স্যার, ঐ ফাস্ট এইড বক্সটা আমাকে দিন'।

আহমদ মুসা তাকে এগিয়ে দিল বক্সটা।

ড্রাইভার বাক্সটি খুলে এর একটা গোপন পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বের করে নাকে চেপে ধরল।

আহমদ মুসা মুহুর্তেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল। ড্রাইভার ক্লোরোফরম করছে নিজেকেই। আহমদ মুসা দ্রুত দিয়ে স্টেয়ারিং হুইলটা ধরে ফেলল। গাড়ি কয়েক মুহুর্ত একটু একে-বেঁকে আবার ঠিক হয়ে গেল।

আহমদ মুসা নিজের পকেট থেকে এক হাজার ফ্রাংকের একটা নোট বের করে সংজ্ঞাহীন ড্রাইভারের পকেটে গুজে দিল। তারপর গাড়ির গতি একটু স্লো করে ড্রাইভারকে গড়িয়ে নামিয়ে দিল রাস্তায়।

পেছনের গাড়িটি একেবারে কাছাকাছি এসে গিয়েছিল।

ড্রাইভারকে গড়িয়ে দেবার পর আহমদ মুসার গাড়ি পূর্ণ গতি পাওয়ার আগেই পেছন থেকে এক ঝাক গুলী ছুটে এল আহমদ মুসার গাড়ি লক্ষ্যে।

একটা টায়ার সশব্দে ফেটে গেল আহমদ মুসার গাড়ির। আহমদ মুসার গাড়ি পাক খেয়ে রাস্তা থেকে নেমে এল। যেখানে নেমে এল সেটাও একটা রাস্তা। দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এগিয়ে গেছে পাহাড় শ্রেণীর আরও গভীরে।

আহমদ মুসা ফেটে যাওয়া টায়ার নিয়েই কিছুটা এগিয়ে গেল। আর যাওয়া সম্ভব নয়। ওরা গুলী করতে করতে পেছনে পেছনেই আসছে।

আহমদ মুসা রাস্তার একটা বাকে এসে বাক সংলগ্ন পাহাড়ের গা ঘেষে গাড়িটাকে রাস্তার আড়াআড়ি দাড় করিয়ে দিল এবং গাড়ির আড়ালে গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। পকেট থেকে হ্যান্ড গ্রেনেডটি বের করে নিয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমেই সে হ্যান্ড গ্রেনেডটি ছুড়ে মারল পেছনে এসে দাড়ানো গাড়ি লক্ষ্যে।

আহমদ মুসার গাড়ি দাড়িয়ে পড়ার সংগে সংগেই পেছনের গাড়িটাও আহমদ মুসার গাড়ির পেছনে এসে দাড়িয়ে পড়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল ওরাও। এই সময় আহমদ মুসার হ্যান্ড গ্রেনেড গিয়ে আঘাত করল গাড়িটাকে।

মুহুর্তেই বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে গেল গাড়ি।

কিন্তু দু'জন বেচে গিয়েছিল বিস্ফোরণ থেকে। তারা চলে এসেছে আহমদ মুসার গাড়ির এ পাশে।

আহমদ মুসা যখন ওদের দেখতে পেল, তখন ওরা ওদের স্টেনগান উচিয়ে তুলছে।

আহমদ মুসা গাড়ির সামনের প্রান্তে দাড়িয়ে ছিল। সে ঝাপিয়ে পড়ল গাড়ির ওপাশে গাড়ির আড়াল নেবার জন্যে।

এক ঝাক গুলী উড়ে গেল গাড়ির ওপর দিয়ে। একটা গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল জুতা সমেত আহমদ মুসার পা'কে।

প্রবল ঝাকুনি দিয়ে উঠল আহমদ মুসার গোটা দেহ। কিন্তু ওদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ না করে আহমদ মুসা গাড়ির ওপাশে আছড়ে পড়ার পরেই শরীরটাকে বাকিয়ে গাড়ির এ প্রান্তে নিয়ে এল নিজের মাথাকে। উকি দিয়ে দেখল ওরা দু'জন ছুটে আসছে এদিকে। আহমদ মুসা দু'হাতে রিভলবার ধরে গুলী করল পর পর দুটো। গুলী খেয়ে দু'জনই প্রায় এক সাথেই আছড়ে পড়ল।

আহমদ মুসা সেদিকে একবার তাকিয়ে উঠে দাড়াবার উদ্যোগ নিল। এমন সময় হাইওয়ের দিক থেকে হর্ণের শব্দ ভেসে এল। সেই আগের মতই একই মাপে এবং একই টোনে।

আহমদ মুসা বুঝল, ব্ল্যাক ক্রস-এর আরেকটা গাড়ি আসছে।

আহমদ মুসা পাহাড়ের উপর তাকাল। দেখল, উপরে গাছপালা ক্রমশঃই ঘন। পাহাড়ের এদিকটা খুব খাড়াও নয়।

আহমদ মুসা আহত পা'টাকে টেনে টেনে ক্রলিং করে পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগল।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বড় কয়েকটি গাছের আড়ালে একটা ঘন ঝোপে গিয়ে পৌছাল। জায়গাটা সমতল। ক্লান্ত আহমদ মুসা শুয়ে পড়ল জায়গাটায়। অবিরাম রক্ত ঝরছে পা থেকে ঝিম ঝিম করছে তার গোটা শরীর।

কয়েক মুহুর্ত পর একটা গাছে হেলান দিয়ে পাহাড়ের নিচের দিকে তাকাল। দেখল, একটা গাড়ি এসে থেমেছে আহমদ মুসার গাড়ির সামনেই। গাড়ি থেকে নেমেছে চারজন লোক ওদের সবার হাতে স্টেনগান। ওরা ঘুরে ঘুরে লাশগুলো পরীক্ষা করছে। আহমদ মুসা ভাবল, আহমদ মুসার লাশই তারা খুজছে।

খোজা শেষে ওরা এক সাথে দাড়িয়ে কিছু আলোচনা করল। তারপর ওরা এক সাথেই পাহাড়ের উপরের দিকে তাকাল।

আহমদ মুসা নিশ্চিত হলো, ওরা সন্দেহ করছে পাহাড়ের ওপরে কোথাও সে লুকিয়ে আছে। ওরা এখন ওপরে উঠবে।

আহমদ মুসা পাহাড়ে উঠে আসার সময় ওদের একজনের স্টেনগান নিয়ে এসেছিল। ওটাকে হাতে তুলে নিল সে।

ওরা পাহাড়ে উঠতে শুরু করেছে। ওদের উঠার লাইন দেখে আহমদ মুসা বুঝল ওরা রক্তের দাগ অনুসরণ করেই এগিয়ে আসছে।

ওরা গুলীর বিরামহীন দেয়াল সৃষ্টি করে এগিয়ে আসছে। ওদের প্রত্যেকের স্টেনগানেই সাইলেন্সার লাগানো। সুতরাং কোন শব্দ হচ্ছে না, শুধু দেখা যাচ্ছে আগুনের ঝলক এবং পাওয়া যাচ্ছে বারুদের গন্ধ।

দু'একটা করে গুলী আহমদ মুসার আশেপাশে এসে পড়তে লাগল।

আহমদ মুসা একটা মোটা গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। এতে ওদের গুলীর হাত থেকে বাচা যাচ্ছে, কিন্তু স্টেনগান নিয়ে গাছের আড়াল থেকে বেরুতে না পারলে ওদের রোধ করা যাবে কেমন করে? ওরা একদম কাছে চলে এসেছে। এখন গুলী বৃষ্টি ঘিরে ধরেছে তাকে। কি করা যায় ভাবছে আহমদ মুসা। ওদের গুলীর বিরতি না হলে ওদের তাক করাও তো সম্ভব নয়। প্রথম গুলী মিস হলে পরে গুলী করার সুযোগ সে নাও পেতে পারে।

পায়ের কাছেই একটা বড় পাথর দেখতে পেল আহমদ মুসা। সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধিটা মাথায় এল। সে পাথরটি তুলে নিয়ে ছুড়ে মারল পাশের ঝোপটার দিকে।

কাজ হলো। পাথরটি ঝোপটাকে সশব্দে আন্দোলিত করার সাথে ওদের চারজনের স্টেনগানই ঘুরে গেল সেদিকে।

এই সুযোগের অপেক্ষা করছিল আহমদ মুসা। সে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে স্টেনগানের ট্রিগার চেপে তার ব্যারেলটা একবার ঘুরিয়ে আনল ঐ চারজনের উপর দিয়ে।

তারপর স্টেনগান ফেলে দিয়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে নেমে আসল নিচে।

দাড়াতে পারছিল না আহমদ মুসা। অসীম ক্লান্তি ও দুর্বলতায় তার দেহ ভেংগে আসছিল। বুঝতে পারল আহমদ মুসা রক্তক্ষরণ দুর্বল করে দিয়েছে তার দেহ।

দাড়াতে গিয়ে দেখল দেহ তার টলছে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে তার।

সে হামাগুলি দিয়ে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। কোন রকমে তাকে হাইওয়েতে পৌছাতে হবে, ভাবল আহমদ মুসা।

ড্রাইভিং সিটে বসে মাথা ঠিক মত খাড়া করে রাখতে পারছিল না আহমদ মুসা।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আহমদ মুসা চলতে শুরু করল। কিন্তু সে বুঝতে পারল না, তার গাড়ি হাইওয়ের দিকে না গিয়ে উল্টো দিকে চলছে।

যে পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল আহমদ মুসা, সে পাহাড়ের পাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল তার গাড়ি। ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছিল না আহমদ মুসা। একটা পা অকেজো, অসহ্য যন্ত্রণা তাতে। একে-বেকে এগিয়ে চলছিল গাড়ি। তাও বেশী দুর এগুতে পারলো না।

সামনেই ছিল আরেকটা পাহাড়। সেখান থেকে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছিল উত্তর দিকে।

আহমদ মুসা সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়ল সিটের উপর। গাড়িটি পাহাড়ের ঢালে ধাক্কা খেয়ে এদিক সেদিক একেঁ-বেঁকে অবশেষে থেমে গেল।

দূরবীণে চোখ রেখেই চিৎকার করে উঠল জিনা লুইসা, 'দেখ দেখ আব্বা, আম্মা, মার্ক'।

জিনা লুইসা যাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তারাও দূরবীণ চোখে লাগিয়ে তাকাল জিনা লুইসার দৃষ্টি অনুসরণে।

চারজন দূরবীণ চোখ লাগিয়ে নির্বাকভাবে দেখছিল জীবন দেয়া-নেয়ার একটি বীভৎস দৃশ্য।

'ও গড, ছবির দেখা দৃশ্যের চেয়েও ভয়ংকর'। দূরবীণে চোখ রেখেই আর্ত কন্ঠে বলে উঠল ফ্রাংক মরিস, জিনা লুইসার আব্বা।

'ওরা যে লোকটাকে তাড়া করে এনেছিল, সেই ওদের গাড়ি উড়িয়ে দিল। গাড়ি থেকে যারা নামছিল তারাও বাঁচল না'। দূরবীণে চোখ রেখেই বলল জিনা লুইসা।

‘কিন্তু দেখ, মরল লোকটা, দু’জন তাকে স্টেনগান তাক করেছে’। দূরবীণ চোখে রেখেই চিৎকার করে উঠল মার্ক মরিস, জিনার ছোট ভাই।

‘আঃ লোকটা গুলী খেয়ে পড়ে গলে নাকি?’ বলল জিনা লুইসা।

‘না, আগেই লাফ দিয়েছে। দেখ লোকটার পায়ে গুলী লেগেছে। রক্ত বেরুচ্ছে, কাঁপছে পা’। বলল মিসেস গাব্রিয়েলা, জিনা ও মার্কের মা।

‘মার্ক দেখ, লোকটা বেঁচে আছে। এদিকে ফিরে লোকটা ওর দিকে এগিয়ে যাওয়া লোক দু’জনকে তাক করছে। হুররে দেখ, গুলী করেছে এ দু’জনকে। দেখ পড়ে গেছে দু’জন লোক’।

‘আহত লোকটি পাহাড়ের উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। লোকটা বিদেশী’। বলল ফ্রাংক মরিস।

‘আব্বা, আরেকটা গাড়ি আসছে। ওরা কোন পক্ষের?’ বলল জিনা লুইসা।

‘ওরা চারজনই ফরাসি, দেখ ওরা নিশ্চয়ই আহত লোকটাকেই খুঁজছে’। বলল ফ্রাংক মরিস।

‘সর্বনাশ, ওরা আহত লোকটার খোজে পাহাড়ের উপরে উঠছে’। বলল মার্ক মরিস।

‘নিশ্চয় ওরা আহত লোকটার রক্তের দাগ অনুসরণ করছে’। বলল মিসেস গাব্রিয়েলা।

‘ওরা আহত লোকটাকে হত্যাই করতে চায়, দেখ স্টেনগান থেকে গুলী করতে করতেই ওরা উঠছে’। বলল জিনা লুইসা।

‘ঐ ঝোপেই তো লোকটা লুকিয়ে আছে। নিশ্চয় লোকটা এতক্ষণে মরে গেছে। ওদের গুলী তো এক ফুট জায়গাও বাদ রাখছে না’। বলল মার্ক মরিস।

‘না না দেখ, ওরা চারজন পড়ে গেল। নিশ্চয় আহত লোকটা গুলী করেছে’। বলল জিনা।

‘হ্যাঁ, ঐ তো আহত লোকটা বেঁচে আছে। গড়িয়ে নামছে পাহাড় থেকে’। বলল মিসেস গাব্রিয়েলা।

‘লোকটি দেখ দুর্বল হয়ে পড়েছে, দাঁড়াতে পারছে না। গাড়িতে উঠছে কেন? আহত পা। চালাতে পারবে গাড়ি?’ বলল জিনা লুইসা।

‘সর্বনাশ গাড়ি চালাতে পারছে না একসিডেন্ট করবে’। বলল ফ্রাংক মরিস।

‘চল আব্বা, ওর গাড়ি থামাতে হবে’। চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে বলল জিনা।

সবাই চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে ফেলেছে। তারা দেখল তারা যে পাহাড়ে দাড়িয়ে সেই পাহাড়ে এসেই ধাক্কা খেল গাড়িটা।

‘ওরা চারজনই নিচে নেমে এল গাড়ি যেখানে দাড়িয়ে পড়েছে সেখানে।

ফ্রাংক মরিসের এই পরিবার সুর লোরে এসেছিল পিকনিক করতে। যদিও দিনটা ছিল বুধবার। ফ্রাংক মরিস ছুটি ভোগ করছিল বলেই এদিন তারা এসেছিল সুর লোরে’তে। সুর লোরের গোটা এলাকা মানুষে গম গম করে সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে। সারাদিন কাটিয়ে যায় মানুষ এখানে গোটা পরিবার নিয়ে।

ফ্রাংক মরিসের পরিবার বাস করে সুর লোরে থেকে ৫ মাইল দক্ষিণে লোরে নদীর ওপারে দ্বিজন গ্রামে। শস্য ভান্ডার এক বিশাল উপত্যকার মাথায় ফ্রান্সের বিখ্যাত একটি জনপদ এই দ্বিজন।

মিঃ ফ্রাংক মরিস একটি মিডল স্টান্ডার্ড স্কুলের অধ্যাপক।

তার মেয়ে জিনা লুইসা এবং ছেলে মার্ক মরিস দু’জনেই কলেজে পড়ে। তাদের মা মিসেস গাব্রিয়েলা একটা সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের একজন নির্বাহী পরিচালক।

গাড়ির দরজা খুললো ফ্রাংক মরিস। দেখল, তাদের দেখা সেই আহত লোকটির মাথাটা সিটের উপর, আর দেহের বাকি অংশটা গড়িয়ে পড়েছে সিটের নিচে।

‘লোকটি বেঁচে আছে আব্বা?’ উদ্বিগ্ন কন্ঠ জিনা লুইসার।

মিঃ ফ্রাংক মরিস নাড়ী ও নিঃশ্বাস পরীক্ষা করে বলল, ‘হ্যাঁ বেঁচে আছে। তবে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা হওয়া প্রয়োজন’।

বলে মিঃ ফ্রাংক আহমদ মুসাকে পাঁজাকোলে করে বের করে আনল। শুইয়ে দিল।

'একেবারে ছেলে মানুষ তো! শিশুর মত সরল চেহারা। এ এত খুনোখুনি করল?' বলল গাব্রিয়েলা।

'এমন গোল্ডেন কালার এশিয়ার কোন দেশের লোকের হয় আব্বা?' বলল জিনা লুইসা।

'এশিয়ার অনেক দেশেই আছে। তবে এর মধ্যে তুর্কি ও মংগোলীয় চেহারার সংমিশ্রণ দেখা যাচ্ছে।

মিঃ ফ্রাংক মরিস ইতিহাসের অধ্যাপক।

কথা শেষ করেই মিঃ ফ্রাংক স্ত্রী গাব্রিয়েলাকে বলল, 'তুমি মার্ককে নিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে জিনিসপত্র সহ ওপারে গাড়ির কাছে যাও। আমরা একে এই গাড়িতে করে আমাদের গাড়ির কাছে যাচ্ছি'।

বলে মিঃ ফ্রাংক দ্রুত আহমদ মুসাকে গাড়ির পেছনের সিটে তুলে নিল। তারপর ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। জিনা বসল পেছনের সিটে সংজ্ঞাহীন আহমদ মুসার মাথার কাছে।

'আব্বা, এ জ্ঞান হারিয়েছে কি অধিক রক্তক্ষরণের জন্যে?'

'আশু কারণ হয়তো তাই। কিন্তু তার শরীরের উপর দিয়ে আরও ধকল গেছে মনে হচ্ছে। হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা। বড় ধরণের আঘাত বলে মনে হচ্ছে। তার কপালের ক্ষতটাও খুবই তাজা। কাঁচা রক্তের দাগ আছে ব্যান্ডেজে'।

'আব্বা, ঘটনাকে আপনার কি মনে হয়?'

'বলা খুব মুস্কিল। একজন লোককে এত লোক তাড়া করা বিস্ময়কর। যারা তাড়া করে এসেছিল, তাদেরকে চেহারা-ছুরতে ভাল লোক বলে মনে হয়নি কিন্তু তার চেয়ে বিস্ময়কর হলো, অল্প বয়সী একজন যুবক এত লোককে মোকাবিলা করে জয়ী হলো। সাধারণ কেউ হলে এটা সম্ভব হতো না'।

'বিদেশী কোন গুপ্তচর কিংবা মাফিয়া চক্রের কোন সদস্যের মত অসাধারণ কেউ কিনা আব্বা?'

‘প্রতিপক্ষ যদি পুলিশ হতো, তাহলে গুপ্তচর ধরণের কিছু ভাবা যেত। অন্যদিকে মাফিয়া চক্রের সদস্য সর্বনিম্ন যে চেহারার হয়, তা এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। মানুষের মুখের দিকে তাকালে তার পাপ-পূণ্য দেখা যায়। কিন্তু এর চেহারায় কোন পাপ নেই মা’।

‘আব্বা, এঁর পকেটে একটা রিভলবার। একটা গুলীও খরচ হয়নি’।

‘এটা তাহলে দ্বিতীয় রিভলবার। একটা রিভলবার দিয়ে তো গাড়ির আড়ালে শুয়ে গুলী ছুড়েছিল এবং তাতে দু’জন লোক মারা যায়’।

‘একজনের কাছে দুই রিভলবার? তাহলে এও তো সাংঘাতিক কেউ আব্বা?’

‘বললাম না, অসাধারণ কেউ। লড়াই দেখেই তা বুঝা গেছে’।

‘আব্বা, পকেটে পরিচয় পাওয়ার মত কিছু নেই, একটা পকেটে ৪শ’ ফ্রাংক মাত্র’।

গাড়ি গিয়ে পৌছাল পাহাড়ের ওপাশে। মিঃ ফ্রাংক মরিসদের গাড়ির কাছে। মিসেস গাব্রিয়েলারা তখনও এসে পৌছায়নি।

মিঃ ফ্রাংক ও জিনা লুইসা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

মিঃ ফ্রাংক মরিসদের গাড়ি একটা ছোট মাইক্রোবাস। পেছনে আটটা সিট, সামনে দু’টা।

মিসেস গাব্রিয়েলারা এসে পৌছাল।

আহমদ মুসাকে তোলা হলো মাঝের চারটা সিটে। পেছনে জিনিসপত্র নিয়ে বসল মিসেস গাব্রিয়েলা। সামনে ড্রাইভিং সিটে মিঃ ফ্রাংক, তার পাশের সিটে জিনা এবং মার্ক।

‘ও গাড়িটা দেখছি ভাড়ার ট্যাক্সি?’ বলল জিনা।

‘হ্যাঁ, গাড়িটা নানতেজ-এর একজন ট্যাক্সি চালকের’।

‘তাহলে গাড়িগুলো সব নানতেজ থেকেই এসেছে’ বলল মার্ক।

‘হতে পারে’। বলল ফ্রাংক।

দশ মিনিটের মধ্যে ওরা দ্বিজন গ্রামের বড় ক্লিনিকটিতে এসে হাজির হলো। ক্লিনিকটির পরিচালক মিঃ ফ্রাংকের ভাই।

ইমারজেন্সিতে প্রাথমিক পরীক্ষার পর ডাক্তার জানাল, শুধু রক্তক্ষরণ নয়, না খাওয়া, দুর্বলতা, ক্লান্তি সব মিলিয়ে জ্ঞান হারিয়েছে। একে দীর্ঘ সময় বেঁধে রাখা হয়েছিল। হাত-পায়ে প্লাষ্টিক কর্ডের গভীর দাগ দেয়া যাচ্ছে। লোহার রড জাতীয় কোন শক্ত জিনিস দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়েছিল। আঘাতটা কপাল ও ডান বাহুর উপর দিয়ে পিছলে গেছে। কপালের থেতলে যাওয়া এবং ডান বাহুর কালশিরা বড় ধরণের আঘাতেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর বাম হাতের তালুর আঘাতটা ধারাল ছুরি জাতীয় কিছুর। হাতের তালু এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে হয়েছিল।

পরনের ট্রাউজার ছাড়া গা থেকে সব কাপড় খুলে নেয়া হয়েছিল আহমদ মুসার। জুতাও। জুতার ভেতর থেকে পাঁচশ' ডলারের একটা নোট পাওয়া গেল।

সবাই আহমদ মুসার টেবিল ঘিরে দাড়িয়েছিল।

ডাক্তার আহমদ মুসার খোলা শরীরটার দিকে তাকিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে বলল, 'এ রকম ভারসাম্যপূর্ণ পেশীর শরীর আমি দেখিনি। ডাক্তারী শাস্ত্রে একে মিরাকল কম্বিনেশন বলা হয়। এ শরীর অসম্ভব, অসাধ্যকে সম্ভব এবং সাধ্যের মধ্যে আনতে পারে। এ দেহ ইস্পাতের মত শক্ত হতে পারে, আবার মোমের মত নরমও হতে পারে'।

'তোমার অপরাধ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কি দেখছ?' বলল ফ্রাংক।

'অপরাধীর কোন চিহ্ন কোথাও দেখি না'।

'পায়ের আঘাত কি দেখলেন?' বলল জিনা লুইসা।

'ও খুব ভাগ্যবান লোক। পায়ের গোড়ালির সবটুকু গোশত বুলেট তুলে নিয়ে গেছে, কিন্তু হাড় স্পর্শ করেনি'।

ডাক্তার নার্সের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নার্স ইনজেকশনটা এখন দিয়ে দাও। স্যালাইন শেষ হলে অপারেশন থিয়েটারে নিতে হবে। আমি আসছি'। বলে ডাক্তার পাশের কক্ষে চলে গেল।

জিনা লুইসা মার্ককে বলল, মার্ক তুমি ওঁর জুতাটা প্লাষ্টিক ব্যাগে নাও। পরিষ্কার করে আনতে হবে'।

'চল আমরা বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। জিনিস পত্র রেখে আসা যাবে'। সবার দিকে চেয়ে বলল মিঃ ফ্রাংক।

‘না আব্বা, ব্যাপার খুব স্বাভাবিক নয় তো। কেউ একজন আমাদের থাকা দরকার। বলল জিনা।

‘আমি থাকছি, লাঞ্চ করেই জিনা তুমি এসে যেও, তারপর আমি যাব’। বলল মিসেস গাব্রিয়েলা।

‘ধন্যবাদ মা’। বলল জিনা লুইসা।

সকলে বেরিয়ে এল ক্লিনিক থেকে।

মিসেস গাব্রিয়েলা বসল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আহমদ মুসার টেবিলের পাশে।

৪

রাত তখন নয়টা পেরিয়ে গেছে। প্যারিসে জুনের আরামদায়ক রাত।

ডোনা বসে আছে তার টেবিলে। পাশের জানালা খোলা। বাগান, করিডোর পেরিয়ে শোন নদীর স্নিগ্ধ বাতাস এসে প্লাবিত করছে ঘরকে।

ডোনার রেশমের মত সোনালী চুল সেই বাতাসে বার বার এসে আছড়ে পড়ছে দানিয়ুবের মত নীল চোখ এবং নীলাভ-শুভ্র গন্ডের উপর।

কিন্তু কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই ডোনার। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

চোখ থেকে নেমে আসা অশ্রুর ধারায় গন্ড ভেজা। চোখ দু'টি তার লাল। অনেক কেঁদেছে সে। কিন্তু এত কান্নার পরেও বুক ভরা রয়েছে তার ক্ষোভে, আর সমগ্র সত্তা জুড়ে রয়েছে যন্ত্রণার উত্তাপ। সেই উত্তাপেই ঘামছে সে।

বাতাসে উড়ে আসা কয়েকটা সোনালী চুল অশ্রুতে ভিজে গিয়ে গন্ডের সাথে লেপ্টে গেছে। স্থির বসে থাকতে পারছে না ডোনা। মাঝে মাঝে উঠে পায়চারি করছে।

বারবারই একটা কথা ডোনার মনে তীরের মত এসে বিদ্ধ হচ্ছে। আহমদ মুসা প্যারিসে এসেছে, কিন্তু তাকে জানায়নি, সে জানতে পারেনি। ক্লাউডিয়া না বললে ডোনা জানতেই পারত না আহমদ মুসার ফ্রান্সে আসার কথা। ক্লাউডিয়ার বাবাকে নিয়ে ক্লাউডিয়ার বাসায় যেতে পেরেছে কিন্তু তার কাছে আসতে পারেনি কেন? ক্লাউডিয়ার কাছ থেকে শুনতে হবে কেন তাকে আহমদ মুসার কথা? ফ্রান্সে আসবে কিন্তু তাকে আগে জানাবে না কেন?

এই ধরণের শত প্রশ্ন এসে ক্ষত-বিক্ষত করছে ডোনার কোমল হৃদয়টাকে। আহত হৃদয়ের রক্তটাই বেরিয়ে আসছে চোখ দিয়ে অশ্রু হয়ে।

আহমদ মুসা সম্পর্কে ক্লাউডিয়ার প্রশংসার কথাও অন্তরে তার তীর ফুটাচ্ছে। ক্লাউডিয়ার মত কোন সুন্দরী তরুণীর কাছে আহমদ মুসার কোন প্রশংসা সে শুনতে চায় না।

আহমদ মুসা বড় কাজ নিয়ে ফ্রান্সে এসেছে, একথা সে ক্লাউডিয়ার কাছে শুনেছে। কিন্তু কাজ যত বড়ই হোক, ডোনার সে খোঁজ নেবে না, দেখা করবে না ডোনার সাথে?

আবার ক্ষুব্ধ মন বলে উঠছে, দেখা করবে কেন ডোনার সাথে? ডোনা তার কে? কেউ তো নয়।

এই কথা ভাবতে গিয়ে অশ্রু উথলে উঠল দুই চোখে। বিছানায় নিজেকে ছুড়ে দিয়ে বালিশে মুখ গুজে পড়ে রইল ডোনা।

ডোনা ক্লাউডিয়ার বন্ধু। দু'জন এখন একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। দু'জনই তুখোড় ডিবেটার ও টেনিস প্লেয়ার। এই হিসেবে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সূত্রেই ক্লাউডিয়া তার জীবনের অদ্বিতীয় একটা ঘটনা হিসেবে আহমদ মুসার কথা গল্প করেছে ডোনার কাছে।

'ডোনা' 'ডোনা' বলে ডাকতে ডাকতে তার আব্বা মিঃ চার্লস প্লাতিনি ডোনার ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরের মাঝখানে এসে দাড়িয়েছে ডোনার আব্বা।

ডোনা তখনও বালিশে মুখ গুজে পড়েছিল। বালিশে মুখ ঘষে ডোনা মুখ তুলল। উঠে বসল সে।

চোখ দু'টি লাল। অশ্রুতে ভেজা। গন্ডেও অশ্রুর দাগ। বেশ কিছু ভেজা চুল গন্ডের উপর তখনও লেপ্টে আছে।

'কি হয়েছে ডোনা?' বলে উদ্বিগ্ন মিঃ প্লাতিনি- এগিয়ে এসে ডোনার পাশে তার খাটে বসল।

'কিছু হয়নি আব্বা'। মাথার রুমাল দিয়ে চোখ ভালো ঘসে বলল ডোনা।

ডোনা এখন মাথায় রুমাল পরে। বিশ্ববিদ্যালয়েও। এ নিয়ে আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু কোন বাধা মানেনি। বিশ্ববিদ্যালয় অবশেষে মেনে নিয়েছে। এটা ডোনার বড় বিজয়। কিন্তু ডোনা এ বিজয়কে আহমদ মুসার বিজয় বলে মনে করে। এই রুমাল বা হেড ড্রেস আহমদ মুসাই তার মাথায় তুলে দিয়েছে। গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা আহমদ মুসার কাছে পরাজিত হয়েছে। কিন্তু ডোনা এসব কথাকে তুড়ি মেড়ে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, আমার মূল এবং মৌলিকতা

অবশ্যই আছে, আমার পরিবার ফ্রান্সের সমাজ ও ইতিহাসের একটা মৌল অংগ। তাই মৌলবাদী হতে আমি রাজী।

ডোনার পিঠে হাত বুলিয়ে তার আব্বা বলল, 'আমার শক্ত মা ডোনা বুঝি এমনিতেই কাদে?'

'আমার খুব খারাপ লাগছে আব্বা'। বলে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

'কেন কি হয়েছে?'

'ঘটনা ছোট, কিন্তু আমার খারাপ লাগছে'।

'কি ঘটনা?'

'ক্লাউডিয়ার কাছে শুনলাম, আহমদ মুসা এসেছে। কিন্তু সে আমাকে....' কথা শেষ করতে পারলো না ডোনা। আরো রুদ্ধ হয়ে কন্ঠ তার থেমে গেল।

'জানায়নি, এই তো! পাগল মেয়ে। তার কথাও তো ভাবা দরকার, জানাতে পারেনি কোন তাও তোমার ভাবা প্রয়োজন'।

'আমাদের প্যারিসের ঠিকানা না জানতে পারেন, কিন্তু গ্রামের বাড়ি মন্ট্রেজুর ঠিকানা ও টেলিফোন উনি জানেন। ফ্রান্সে আসার আগেও তিনি জানাতে পারতেন'।

'তুমি তাকে হৃদয় দিয়ে দেখেছ, মাথা দিয়ে চেননি মা। সে শাটল কর্কের মত। সে তো স্থির হবার সময়ই পায় না। তার উপর অবিচার করো না'।

একটু থামল ডোনার আব্বা। তারপর বলল, 'ওর কিছু খারাপ খবর আছে মা'।

'কার খারাপ খবর? আহমদ মুসার? কি খবর, কি হয়েছে?' উদ্বেগ-রুদ্ধ কন্ঠে বলল ডোনা। মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল তার মুখ।

'আজ এক অনুষ্ঠানে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদুতের সাথে দেখা হয়েছিল। আমি তাকে আহমদ মুসার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি জানালেন যে, আহমদ মুসা এসেছেন কিন্তু নিখোঁজ হয়ে গেছেন। তাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হলো। তিনি বললেন, মিঃ ক্লাউডের ওখান থেকে আহমদ মুসা সকালে দুতাবাসে পৌছেন। সারাদিন তিনি বিশ্রাম নেন এবং ব্ল্যাক ক্রস সম্পর্কে পড়াশুনা করেন। সেদিন রাত ১২টায় তিনি বেরিয়ে যান ব্ল্যাক ক্রস-এর একটা ঘাটির উদ্দেশ্যে। আর....'

বাধা দিয়ে ডোনা বলল, 'কেউ তার সাথে যায়নি'।

'বলছি, এ ধরণের অনুসন্ধানমূলক অপারেশনে সে কাউকে সাথে নেয় না। সেদিনও কাউকে সাথে নিতে রাজী হয়নি'।

একটু হাসল মিঃ প্লাতিনি।

'আর তিনি ফিরেননি?' অধৈর্য্য ও উদ্বেগের সাতে ডোনা বলল।

'না আর ফিরেননি'।

'ঐ ঘাটিতে কেউ খোজ নেন নি?'

'নিয়েছে। ভোর রাতে দুতাবাসের লোক সেই ঘাটিতে গিয়ে তিনটি লাশ দেখেছে এবং পেয়েছে পুলিশকে। কিন্তু আহমদ মুসা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি'।

'ঐ লাশ কাদের আব্বা?'

'ব্ল্যাক ক্রস-এর লোকদের। সেই রাত থেকে আহমদ মুসা নিখোজ'।

ডোনা ঠোট কামড়ে তার পিতার কাধে মুখ গুজল। তার চোখ ছল ছল করছে, কাঁপছে তার ঠোঁট।

মিঃ প্লাতিনি মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, 'চিন্তার কথা মা, ব্ল্যাক ক্রস দুনিয়া ব্যাপী খৃষ্টানদের স্বার্থ রক্ষা করছে। এই ক্ষেত্রে তারা করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই। প্রকৃতপক্ষে ব্ল্যাক ক্রস রেডক্রস-এর বিপরীত একটা খুনি সংগঠন'।

'ওদের সাথে আহমদ মুসা কেন সংঘাতে জড়িয়ে পড়ল?' ভাঙা গলায় বলল ডোনা।

ডোনার আব্বা মিঃ প্লাতিনি ওমর বায়ার ঘটনা ডোনাকে সব জানিয়ে বলল, 'ব্ল্যাক ক্রস-এর হাত থেকে ওমর বায়াকে উদ্ধার করার জন্যেই আহমদ মুসা ফ্রান্সে ছুটে এসেছে'।

ডোনা কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বলল, 'তুমি কি ভাবছ আব্বা, ব্ল্যাক ক্রস কি আহমদ মুসাকে আটক করেছে, না...'

কথা শেষ করতে পারলো না ডোনা। কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল তার।

‘চিন্তা করো না মা। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করবেন। সে শুধু একজন মজলুম মানুষকে নয়, একটা মজলুম জাতিকে রক্ষার জন্যে ঝাপিয়ে পড়েছে’।

একটু থামল মিঃ প্লাতিনি। তারপর বলল, ‘আহমদ মুসা অনেক বড়। সে ব্ল্যাক ক্রস-এর চেয়েও অনেক বড় বড় শক্তির মোকাবিলা করেছে’।

এই সময় পাশের টিপয়ে রাখা কর্ডলেস টেলিফোন সংকেত দিয়ে উঠল। মিঃ প্লাতিনি টেলিফোন তুলে নিল হাতে।

কথা বলল টেলিফোনে। বলল ঠিক নয় শুনলই শুধু। শুনতে গিয়ে মাঝে মাঝেই তার ভ্রু কুচকে গেল এবং চিন্তা নতুন রেখা ফেলল তার কপালে।

গম্ভীর মুখে টেলিফোনটা রেখে বলল মিঃ প্লাতিনি, ‘ফিলিস্তিন দুতাবাসের টেলিফোন মা’।

মাথা তুলে উদগ্রীব হয়ে উঠল ডোনা।

‘না মা ভাল খবর নেই। তবে খবরগুলো আমার আশাব্যঞ্জক মনে হচ্ছে’।

‘কি খবর আব্বা?’ ডোনার চোখে আশার আলো।

‘দুতাবাস জানাল, পশ্চিম ফ্রান্সে কয়েকটা বড় ঘটনা ঘটেছে। লোরে নদীতে এক জাহাজে দশটি লাশ পাওয়া গেছে। ঐ দিনই নানতেজ শহরের একটি বাড়ীতে দুটি লাশ পাওয়া গেছে এবং ঐ দিন সুর লোরের পর্যটন স্পটে একটা গ্রেনেড বিধ্বস্ত গাড়িসহ ৬টি লাশ পাওয়া গেছে। মনে করা হচ্ছে গাড়ি বিধ্বস্ত হওয়ায় যারা মারা গেছে তাদের সংখ্যা তিন হবে’।

‘কিন্তু এগুলোর সাথে...’।

‘বলছি, ফিলিস্তিন দুতাবাস অনুসন্ধান করে জেনেছে সবগুলো লাশই ব্ল্যাক ক্রস-এর। তারা মনে করছে, আহমদ মুসার হাতেই এ ঘটনাগুলো ঘটতে পারে’।

ডোনার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘ওদের ধারণাকে ঈশ্বর সত্য করুন। কিন্তু ও যোগাযোগ করছে না কেন তাহলে?’

‘সে কি অবস্থায় আছে, সেটা তো আমরা জানি না মা। ঘটনাগুলো প্রমাণ করে, আহমদ মুসা ব্ল্যাক ক্রস-এর সাথে কঠিন সংঘাতে জড়িয়ে গেছে। দূতাবাস আরও জানাল, তাদের বিশেষজ্ঞরা ঘটনাগুলো দেখেছে, জাহাজের হত্যাকান্ড

আগে ঘটেছে, তারপর নানতেজ শহরের এবং তারপর সুর লোকের। এই বিশ্লেষণ থেকে বলা হচ্ছে, ঈশ্বর করুন আহমদ মুসা ঐসব ঘটনার সাথে জড়িত থাকলে তিনি লোরে নদী থেকে সুর লোরের দিকে এসেছেন বা আনা হয়েছে'।

থামল মিঃ প্লাতিনি।

'তারপর কি আব্বা?'

'এটাই বিস্ময়ের। সুর লোরের পর ঘটনা থেমে গেছে। ফিলিস্তিন, মধ্য এশিয়া প্রজাতন্ত্র, সৌদি আরব, মিন্দানাও দূতাবাসের লোকেরা এলাকা সফর করেছে, কিন্তু কোন সুত্র তারা খুজে পায়নি'।

আবার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল ডোনার।

ভাবছিল ডোনার আব্বা মিঃ প্লাতিনি।

অনেকক্ষণ পর ডোনা মুখ তুলে বলল, আমি সুর লোরে একবার যেতে চাই'।

'কেন মা?'

'আমার মন বলছে আমি ওখানে ওর কোন চিহ্ন খুজে পাব'। ডোনার শেষের কথা ভেঙ্গে ভেঙ্গে বেরিয়ে এল। তার দু'চোখ থেকে ঝর ঝর করে নেমে এল অশ্রু।

মিঃ প্লাতিনি মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে যাব মা। ওদিকে অনেকদিন যাইনি। আমাদের এস্টেটটাও দেখে আসা হবে। কয়েকদিন সেখানে থাকতেও পারি আমরা'।

ডোনা চোখ মুছে বলল, 'আব্বা, ও কি কোনদিন স্থির হবে না? একের পর এক বিপদের মুখে সে ঝাপিয়ে পড়বেই? একজন মানুষকে উদ্ধারের জন্যে ছুটে আসবে চীন থেকে ফ্রান্সে?' আবেগে কন্ঠস্বর কাঁপছিল ডোনার।

'পৃথিবীতে অনেক মানুষ আসেন যারা নিজের জন্যে জন্মগ্রহণ করেন না মা। যারা নিজের চোখের পানিতে ভেসেও অন্যের চোখের পানি মুছে দেন'।

একটু থামল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল মিঃ প্লাতিনি। তারপর বলল, 'আহমদ মুসার আরও খারাপ খবর আছে মা'।

আহত হরিণীর মতই চমকে উঠে মুখ তুলল ডোনা। অশ্রুতে লেপটে যাওয়া তার মুখ। একরাশ প্রশ্ন তুলে ধরল সে চোখে। মুখে কিছুই বলল না।

আবার কথা বলল ডোনার আব্বাই। বলল, ‘সিংকিয়াং-এ আহমদ মুসারই জয় হয়েছে। কিন্তু তার স্ত্রীকে বাঁচাতে পারেনি, জীবিত উদ্ধার করতে পারেনি। নিহত হয়েছে গুলীবিদ্ধ হয়ে’।

‘কি বলছ আব্বা, আহমদ মুসা তো এই আঘাত সইতে পারবে না’। বলে দু’হাতে মুখ ঢাকল ডোনা।

‘আহমদ মুসা শুধু নয়, এই আঘাত সকলকেই কাদিয়েছে। ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূত এই খবর দিতে অশ্রু রোধ করতে পারেন নি। সবচেয়ে বেদনার কি জান, বিয়ের পর দু’জনের আর সাক্ষাত হয়নি। বিয়ের আসর থেকে আহমদ মুসা চলে এসেছিল ককেশাস, সেখান থেকে স্পেন। শেষের ইতিহাস তো আমরা জানি’।

থামল মিঃ প্লাতিনি।

কোন কথা এল না ডোনার কাছ থেকে।

দু’হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল ডোনা। কাঁপছিল তার শরীর। আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু।

মিঃ প্লাতিনি মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ‘আমি শুনেছি, আহমদ মুসা মেইলিগুলিকে হারিয়ে শিশুর মত কেদেছে কিন্তু ভেংগে পড়ে নি সে। কর্তব্যের ডাকে স্ত্রীর লাশ নিয়েই চলে এসেছিল মধ্য এশিয়ায়। তারপর ডুবে গিয়েছিল কাজের মধ্যে’।

‘আব্বা, ওর এই কাজ নিজেকে আড়াল করার একটা কৌশল’। মুখ থেকে হাত নামিয়ে মাথা সোজা করে বলল ডোনা।

‘হতে পারে। তবে এই গুণ দূর্লভ মা’। বলে ডোনার আব্বা মিঃ প্লাতিনি উঠে দাড়াল। বলল, ‘মা তুমি তৈরী হয়ে নিও। আমরা কাল সকালেই সুর লোরের দিকে যাত্রা করতে পারি।

বেরিয়ে গেল ডোনার আব্বা।

ডোনা শুয়ে মুখ গুজল বালিশে।

তার হৃদয়ে ঝড় বইছে। বিধ্বস্ত বুক আহমদ মুসার সামনে সে গিয়ে দাড়াবে কিভাবে। ডোনাকে দেখে তার হৃদয়ের ঘাটা আরও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠবে না? যদি ঘুর্নাক্ষরেও সে ভাবে যে ডোনা তার প্রিয়তমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তাহলে আমি দাঁড়াব কোথায়? কি করে বুঝাব তাকে যে, ডোনার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও স্বার্থ চিন্তা ছিল না। মেইলিগুলি ভাবীর বিষয়টা জানার পর ডোনা একবারের জন্যেও আহমদ মুসাকে ফ্রান্সে থাকতে বলেনি। সমগ্র অন্তর দিয়েই তাদের সুখি দেখতে চেয়েছে। হ্যাঁ, ডোনা চেয়েছে আহমদ মুসা ফ্রান্সে আসুন। কিন্তু সেটা ছিল হৃদয়ের অপ্রতিরোধ্য আবেগের একটা অর্থহীন চাওয়ারই প্রকাশ।

আবার ভাবে ডোনা, আহমদ মুসার মত সুন্দর সুবিবেচক কাউকে সে দেখেনি। ওর চেয়ে নরম হৃদয়ও ডোনার চোখে পড়েনি। তিনি ডোনার প্রতি অবিচার করবেন না। বুঝবেন তিনি ডোনাকে।

পাশ ফিরল ডোনা।

দেখল ঘড়িতে দশটা বাজে।

উঠে বসল সে।

সফরের ব্যাগটা রাতে গুছিয়ে রাখাই ভাল। সকালে উঠেই যাত্রা করা যাবে।

দ্বিজন গ্রাম।

দিগন্ত প্রসারিত উপত্যকার মাথায় বেশ কয়েকটি সমতল পাহাড় নিয়ে গড়ে উঠেছে গ্রামটি।

ছবির মত সুন্দর সবুজ গ্রাম দ্বিজন। বাড়িগুলো আরও সুন্দর।

গ্রামের পাশ দিয়ে পাহাড়গুলোর পা ঘেঁষে বয়ে গেছে নীল পানির এদরে নদী।

গ্রাম থেকে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে দিগন্তের দিকে বয়ে যাওয়া 'এদেরে' নদীকে উপত্যকার সবুজ মাথায় সাদা ফিতার মত সুন্দর দেখায়।

গ্রামের একটি পাহাড়ের মাথায় একটি সুন্দর গীর্জা। গীর্জার মাথায় স্থাপিত ক্রসটি বহুদুর থেকে দেখা যায়।

সেদিন রোববার। গীর্জা মানুষে প্রায় পূর্ণ। প্রার্থনা সংগীত চলছে। হাত তুলে সবাই প্রার্থনায় শামিল। সবারই আনত দৃষ্টি।

গীর্জার এক প্রান্তে পাশাপাশি আসনে বসে জিনা লুইসা এবং ফ্রান্সিস বুবাকের।

জিনা লুইসা দু'হাত তুলে চোখ বন্ধ করে প্রার্থনায় মগ্ন।

ফ্রান্সিস বুবাকের প্রথমে তার হাত উঠায়নি। কিন্তু চারদিকে সবাই হাত উঠানোর পর দ্বিধাগ্রস্থভাবে সেও দু'হাত তুলে ধরেছে।

প্রার্থনা সংগীত শেষ। সবাই বেরিয়ে আসছে গীর্জা থেকে।

জিনা লুইসা এবং ফ্রান্সিস বুবাকেরও চলে আসার জন্যে বেরুল এক দরজা দিয়ে।

গীর্জার একজন কর্মী এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বুবাকেরকে বলল, 'তোমাকে ডাকছেন ফাদার'।

বলে চলে গেল গীর্জার কর্মীটি।

ফ্রান্সিস বুবাকের তাকাল জিনা লুইসার দিকে।

জিনা লুইসার মুখ শুকনো। তার চোখে উদ্বেগের ছায়া।

'ফাদার কেন ডাকলেন আমাকে?' চিন্তিত কন্ঠে বলল ফ্রান্সিস বুবাকের।

'আমারই ভুল, ফাদার নিষেধ করেছিলেন তোমাকে গীর্জায় আনতে'। শুকনো কন্ঠে বলল জিনা লুইসা।

'ও...'। একটা বেদনার ছায়া নেমে এল ফ্রান্সিস বুবাকের চোখে-মুখে।

জিনা লুইসা ফ্রান্সিস বুবাকেরের হাত ধরে বলল, 'ডেকেছেন, চল। আমিও যাব তোমার সাথে'।

দু'জনে চলল ফাদারের কক্ষের দিকে।

জিনা এবং ফ্রান্সিস দ্বিজন গ্রামের একটি মানিক জোড়। ফ্রান্সিস জিনার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। দু'জনের বাড়ি পাশাপাশি নয় কিন্তু কাছাকাছি। দু'জন তারা খেলার সাথী, এখন কলেজের সাথীও।

জিনা ও ফ্রান্সিস গিয়ে হাজির হলো ফাদারের কক্ষে।

ফাদারের বয়স চল্লিশের কোঠায়। পুরোপুরি যুবকই বলা যায়। বসে আছেন তিনি একটা বিশাল চেয়ারে।

জিনা ও ফ্রান্সিস তাঁর সামনে গিয়ে নতমুখে দাঁড়াল।

'জিনা, তোমাকেও আসতে বলেছে? তোমাকে তো ডাকিনি'।

জিনার মুখ লাল হয়ে উঠল। একটা বিব্রত ভাবও ফুটে উঠল তার মুখে। বলল, 'আমি ওঁর সাথে এসেছি। আসতে বলেনি কেউ ফাদার'।

ফাদার জিনার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল ফ্রান্সিস বুবাকেরের দিকে। বলল গম্ভীর কন্ঠে, 'ফ্রান্সিস তোমাকে একথা বলার জন্যে ডেকেছি যে, তুমি পবিত্র হওনি, তোমার গীর্জায় আসা ঠিক নয়। গীর্জা ঈশ্বরের পবিত্র সন্তানদের জন্যে'।

থামল ফাদার।

একটু থেমে আবার বলল, 'দুঃখিত ফ্রান্সিস, একথাগুলো তোমাকে সরাসরি না বলতে পারলেই ভাল হতো'।

জিনা ও ফ্রান্সিস বেরিয়ে এল ফাদারের কক্ষ থেকে।

ফ্রান্সিসের গোটা মুখ লাল। ঠোট কামড়ে ধরেছে সে। আর বেদনায় পাংশু হয়ে উঠেছে জিনার মুখ। শক্ত করে ধরেছে ফ্রান্সিসের হাত নিজের মুঠোর মধ্যে। কিন্তু জিনা তাকাতে পারছে না ফ্রান্সিসের মুখের দিকে।

গীর্জার গেট পেরুবার সময় জিনা ভয়ে ভয়ে একবার তাকাল ফ্রান্সিসের মুখের দিকে। দেখল, চোখ দিয়ে তার অশ্রু গড়াচ্ছে। বেদনায় ও অপমানে নিধ্বস্ত তার সুন্দর মুখ। ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে সে। যেন নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে।

জিনা যে হাত দিয়ে ফ্রান্সিসের হাত ধরেছিল সে হাত দিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ফ্রান্সিস কেঁদ না, তুমি অপবিত্র হলে আমিও অপবিত্র। আমি আর গীর্জায় আসব না'।

এই সময় পেছন থেকে ডাক এল, 'জিনা-ফ্রান্সিস'।

জিনা মুখ ফিরিয়ে দেখল, 'ওল্ড ফাদার'-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী। জিনা ফিরে চাইতেই সে বলল, 'ফাদার ফ্রান্সিসকে ডাকছেন'।

'ওল্ড ফাদার' এই দ্বিজন-গীর্জার পরিচালক। বয়স নব্বই-এর কাছাকাছি। পশ্চিম ফ্রান্সের সবচেয়ে প্রবীণ এবং সবচেয়ে সম্মানিত ধর্মনেতা তিনি। ভ্যাটিকান কাউন্সিলের তিনি একজন সদস্য। সম্প্রতি তিনি দ্বিজন গীর্জার দৈনন্দিন কাজ থেকে রিটায়ার করেছেন।

ফ্রান্সিসকে থামিয়ে দিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে নরম কন্ঠে অনুরোধ করল জিনা, 'ওল্ড ফাদার ডেকেছেন। চল। উনি খুব ভাল মানুষ। উনার সময় দেখ কোন প্রবলেম হয়নি আমাদের'।

বলে জিনা ফ্রান্সিসকে টেনে ওল্ড ফাদারের অফিসের দিকে নিয়ে চলল।

ওল্ড ফাদার তার অফিসে ইজি চেয়ারে শুয়ে আছেন।

জিনা ও ফ্রান্সিস কক্ষে ঢুকে দু'জনেই মাথা ঝুকিয়ে ফাদারকে বাও করে তাঁর সামনে মাথা নত করে দাঁড়াল।

জিনা ও ফ্রান্সিস দু'জনের চোখেই অশ্রু।

ওল্ড ফাদার সেদিকে তাকাল। তার ঠোটে ফুটে উঠল ঈষৎ হাসি। বলল, 'ফ্রান্সিসের কান্না জিনা তোমাকেও কাদিয়েছে। এটা খুবই পবিত্র। ঈশ্বর এই মিলনের অশ্রুকে খুবই ভালবাসেন'।

জিনা ফাদারকে আবার বাও করে বলল, 'ফাদার আমাদের আশীর্বাদ করুন'। জিনার চোখে অশ্রুর বেগ বাড়ল। আবার বলল, 'ফাদার, ফ্রান্সিস অপবিত্র হবে কেন?'

'এসব কথাকে শাব্দিক অর্থে ধরো না। ভাষার পার্থক্য, জাতীয়তার পার্থক্য বুঝাতে যেমন কিছু শব্দ ব্যবহার হয়, তেমনি ধর্মীয় পার্থক্যের ক্ষেত্রেও কিছু শব্দ ব্যবহার করতে হয় মাত্র'।

বলে ওল্ড ফাদার চেয়ার দেখিয়ে দু'জনকে বসতে বলল।

কিন্তু জিনা ও ফ্রান্সিস চেয়ারে না বসে ওল্ড ফাদারের সামনে কার্পেটের উপর বসে পড়ল।

কথা শেষ করেই ওল্ড ফাদার চোখ বুজেছিল। ধীরে ধীরে চোখ খুলল ফাদার। তাকাল ফ্রান্সিসের দিকে। বলল, 'ইন্টারকমে আমি সব কথাই শুনেছি ফ্রান্সিস। কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন? অপমানে? অপবিত্র বলার কারণে?'

ফ্রান্সিস কোন জবাব দিল না।

ওল্ড ফাদারই আবার কথা শুরু করল। বলল, 'বোকা ছেলে। তুমি, তোমাকে জাননা বলেই কেঁদেছ, অপমান বোধ করেছ। যদি জানতে তুমি কে, তাহলে এই 'অপবিত্র' হওয়াটাই তোমার জন্যে গৌরবের হতো'।

থামল ফাদার। একটু নড়ে-চড়ে শুয়ে চাদরটা গায়ের উপর ভালো করে তুলে নিয়ে বলল, 'শুনলাম তুমি কাঁদছ। তাই তোমাকে ডেকেছি দু'টো কথা বলার জন্যে। আহত হৃদয়ের কান্না ঈশ্বর সইতে পারেন না'।

আবার থামল ওল্ড ফাদার। চোখ দু'টি ওপরের দিকে নিবদ্ধ করে ভাবল কয়েক মুহূর্ত। তারপর শুরু করল, 'ফ্রান্সিস তোমার ধর্ম ইসলাম, মহান ধর্ম। মহত্তম ধর্ম। আমি তোমাদের ধর্মগ্রন্থের অনেক অংশ পড়েছি। জীবনের শেষ প্রান্তে দাড়িয়ে আজ স্বীকার করতে আনন্দ লাগছে, আমাদের প্রভু যেখান থেকে বাণী পেয়েছিলেন, তোমাদের নবী ইসলামের নবী মোহাম্মদও সেখান থেকেই বাণী পেয়েছিলেন। একজন খৃষ্টান ধর্মনেতা হয়েও আমি স্বীকার করছি, ফ্রান্সিস তোমার গর্ব করা উচিত তোমাদের ধর্মই একমাত্র যুগের দাবী পূরণ করছে, সময়ের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে এবং অনাগত কালের প্রয়োজনও তোমাদের ধর্ম পূরণ করার সামর্থ রাখে। একথাগুলো স্বীকার করতে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে না। কারণ আমি ঈশ্বরের পূজক। আর আমার ঈশ্বরেরই শেষ ধর্ম হলো ইসলাম। তুমি জাননা ফ্রান্সিস, পৃথিবীর ১২৫ কোটি মানুষ তোমার ধর্মের অনুসারী এবং অত্যন্ত সক্রিয় অনুসারী'।

থামল ফাদার।

এক নাগাড়ে কথাগুলো বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ফাদার।

জিনা এবং ফ্রান্সিস বিস্ফোরিত চোখে শুনছিল ওল্ড ফাদারের কথা। পৃথিবীতে মহান এক সভ্যতার জন্ম দিয়েছে, যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিশ্বাস একে-অপরের পরিপূরক। ফ্রান্সিস, তোমাদের সভ্যতাই আমাদের অন্ধকার ইউরোপে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছিল। আজকের ইউরোপের বিজ্ঞানের যে অহংকার, তার জন্মদাতা তোমাদের ধর্ম ইসলাম। শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান নয়, রাজনৈতিক শক্তিতেও তোমাদের ধর্ম অপ্রতিরোধ্য। মৌলবাদী, সাম্পদায়িক, পশ্চাতপন্থী ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে এই শক্তির অগ্রগতি রোধ করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু আমি বলছি, রোধ করা যাবে না। পৃথিবীর বিশেষ করে আমাদের পশ্চিমের মানুষ অন্তরের ক্ষুধায় যেভাবে অস্থির হয়ে উঠছে, অনৈতিকতা ও অনাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে যেভাবে পাগল হয়ে উঠেছে, তাতে ইসলামের মৌলবাদ অর্থাৎ ইসলামের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন নৈতিক জীবনই তাদের কাছে একমাত্র বিকল্প হয়ে দাঁড়াচ্ছে'।

থামল ওল্ড ফাদার আবার। হাপিয়ে উঠছেন তিনি।

অপার বিস্ময় এসে গ্রাস করেছে জিনা ও ফ্রান্সিসকে। তারা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে ওল্ড ফাদারের কথা। তাদের চোখের পানি কখন যেন শুকিয়ে গেছে।

ইজি চেয়ারে একটু সোজা হয়ে বসে শুরু করল আবার ওল্ড ফাদার। বলল, 'আমি যে পাহাড়ে, যে দ্বিজন গ্রামে বসে কথা বলছি, সেটা ছিল, ফ্রান্সিস, তোমার ধর্ম ইসলামের বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্ত দাঁড়ানো একটা শক্ত ঘাটি। লোরে নদী ও এদেরে নদীর মর্ধবর্তী এই দ্বিজনে ছিল ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা কেল্লা। যে পাহাড় শীর্ষের উপর বসে আমি কথা বলছি, সে পাহাড় শীর্ষে গীর্জার একটু উত্তরে বিরাট স্থান জুড়ে ইট-সুরকি আর পাথরের তৈরী যে বেদী তোমরা দেখ ওটা ছিল মুসলিম দুর্গ দ্বিজনের একটা পর্যবেক্ষণ টাওয়ার। সে সময়টা ৬শ বছর আগের। দক্ষিণ ফ্রান্স এবং পশ্চিম ফ্রান্সের বিশাল এলাকা জুড়ে তখন একটা মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও এই দ্বিজনে মুসলিম উপস্থিতি বেশী দিন ছিল না কিন্তু মুসলিম সালতানাতটি প্রতিষ্ঠিত ছিল প্রায় একশ' বছর। এখান থেকে ৫৫ মাইল দক্ষিণে ক্লেন নদীর তীরে আজকের পোয়েটার নগরীর জায়গায় ইউরোপের সাথে মুসলিম সালতানাতের যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেই

যুদ্ধের পরই এই এলাকা মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়। ফ্রান্সের পূর্ব-দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী নারবো ছিল ফ্রান্সের মুসলিম সালতানাতের রাজধানী। দক্ষিণ ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় নদী গেরনের সাথে খাল কেটে নারবো'র সংযোগ সাধন করা হয়েছিল এক সময়। ফলে মিলে গিয়েছিল আটলান্টিক এবং ভূমধ্যসাগর। সেই বিখ্যাত খালটিই পরিবর্ধিত হয়ে আজ নারবো থেকে পশ্চিম প্রান্তের লংগন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে'।

থামল ওল্ড ফাদার। চোখ বুজে কথা বলছিল ফাদার। তার কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। গা থেকে ফাদার তার চাদর নামিয়ে দিল। হাঁপাচ্ছিল ওল্ড ফাদার। এক সংগে অনেক কথা বলেছেন।

জিনা এবং ফ্রান্সিস নিজেদের হারিয়ে ফেলিছিল ওল্ড ফাদারের এই কাহিনীর মধ্যে। দ্বিজন এবং ফ্রান্সের সেই অতীতটা তাদের চোখের সামনে বর্তমান হয়ে উঠেছিল। তারা যেন দেখতে পাচ্ছিল দ্বিজনের সেই পর্যবেক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্র। বিশেষ করে ফ্রান্সিস বুবাকের যেন নবজন্ম লাভ করল ওল্ড ফাদারের কথায়। ফ্রান্সিস জানতো খৃষ্টান থেকে তার ধর্ম আলাদা। কিন্তু দেখত তার ক্ষুদ্র ধর্মটির কোন নাম-ধাম কোথাও নেই। বরং ছোটবেলা থেকেই সে শুনে আসছে মুসলমানরা এক খুনে জাতি, আচার-আচরণে অসভ্য ও বর্বর তারা। তার মনে পড়ে একবার সে উত্তর ফ্রান্সের এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিল। বন্ধুর বোন তাকে বলেছিল, আমি শুনেছি, আমাদের ইতিহাসের শিক্ষক বলেছেন, মুসলমানরা মানুষ খেকো। কিন্তু তোমাকে দেখে তো তেমন মনে হচ্ছে না? ছোটবেলা থেকে সর্বত্র সব জায়গায় এ সব শুনে তার ধর্মের জন্যে এবং নিজে মুসলিম হওয়ার জন্যে সে লজ্জা বোধ করতো। অপরিচিত কাউকেই সে নিজের পরিচয় দিত না। এমনকি মায়ের কাছেও ধর্ম সম্বন্ধে কোন কথা তুলতে সে সাহস পেত না। ফ্রান্সিস বাবাকে হারিয়েছে অনেক আগে। শুনেছে তার মা খৃষ্টান থেকে মুসলিম হয়ে তার আব্বাকে বিয়ে করে। ফ্রান্সিস যুক্তি খুজেঁ পেত না কেন তার মা মুসলমান হয়। তবে ফ্রান্সিসের মনে মনে গর্ব হতো, তার মা এখন মুসলমান হলেও এক সময় খৃষ্টান ছিল। পরিচিত বন্ধুদের সবাইকে সে একথা বলতো। তার আব্বাকে খুবই মনে পড়ে ফ্রান্সিসের। খুব ভালো, খুব সুন্দর মানুষ ছিলেন তিনি। মুসলমানকে কেউ

গালি দিলে খুব দুঃখ পেতেন তার আব্বা। কোন এক হলিডে'তে এক খোশগল্পের আসরে একজন তার দেশপ্রেম দেখাবার জন্যে একটা কাগজে অর্ধচন্দ্র একে এবং আরেকটা কাগজে মুসলিম ধর্মগ্রন্থের নাম লিখে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছিল। আব্বা সে আসর থেকে তাকে নিয়ে নীরবে চলে এসেছিলেন। ধর্ম নিয়ে সেদিনই শুধু তার চোখকে অশ্রু সিক্ত হতে দেখেছে ফ্রান্সিস। মনে পড়ে তার আব্বা বলেছিলেন, 'আমি আমার ধর্মগ্রন্থ দেখিনি, ইসলামের অর্ধচন্দ্র খচিত পতাকাও দেখিনি। কিন্তু তবু তো এগুলো আমাদের'। ফ্রান্সিস কোন দিনই তার পিতার এই অশ্রুর কথা ভুলতে পারেনি। নিজ ধর্মের ব্যাপারে হতাশ ও দুর্বল হয়ে পড়লেই পিতার এই কথা তার মনে পড়তো। এখান থেকেই সে শক্তি পেত নিজ ধর্ম যত তুচ্ছই হোক তার উপর টিকে থাকার। কিন্তু ওল্ড ফাদারের কথা শুনে আজ গর্বে তার বুক ভরে গেল। বুঝল, তার ধর্ম শুধু বড় নয়, খৃষ্টান ধর্মের চেয়েও এবং মহত্তর। তার আরও গর্ববোধ হলো, তার মাতৃভুমি এই ফ্রান্সেও তার ধর্মের রাজত্ব ছিল। ফ্রান্সিস সবচেয়ে খুশী হলো ওল্ড ফাদারের এই কথায় যে, অন্ধকার ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছিল তার ধর্মই।

অনেকক্ষণ পর চোখ মেলল ওল্ড ফাদার।

জিনা ও ফ্রান্সিস এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার দিকে।

ওল্ড ফাদারের ঠোটে এক টুকরো হাসি। তার চোখ নিবদ্ধ হলো ফ্রান্সিস বুবাকের উপর। বলল, 'আর গীর্জায় যাওয়ার তোমার প্রয়োজন হবে বৎস? এত কথা বললাম তুমি কে তা বুঝাবার জন্যে'।

ফ্রান্সিস উঠে দাড়িয়ে ওল্ড ফাদারকে মাথা ঝুকিয়ে বাও করে বলল, 'প্রয়োজন হবে না ফাদার। আপনি আমাকে নতুন জীবন দিয়েছেন'।

ফাদারের ঠোটের হাসি আর একটু প্রসারিত হলো। বলল, 'বৎস ফ্রান্সিস, তোমার ধর্মে একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কোন মানুষের কাছে মাথা নত করার বিধান নেই। তোমার ধর্ম ইসলাম সব মানুষকে সমান করে দিয়েছে'।

আবার বাও করল ফ্রান্সিস।

জিনা উঠে দাড়াল। তার মুখ ভরা হাসি।

ওল্ড ফাদার এক টুকরো স্নেহের হাসি হেসে বলল, ‘ফ্রান্সিসের ধর্মের প্রশংসায় তুমি যে খুশী জিনা?’

জিনার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, ‘ফাদার আপনি ফ্রান্সিসের অবনত মাথাকে আজ উন্নত করে দিয়েছেন। তার হৃদয়ের অসহনীয় এক যন্ত্রণার আপনি উপশম ঘটিয়েছেন। আমার বিশ বছর জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন আজ ফাদার। ফাদার, ওকে গীর্জায় এনে সান্ত্বনা দেয়ার এবং বড় করার এতদিন ব্যর্থ চেষ্টা করতাম!’ জিনার কন্ঠ ভারি হয়ে উঠেছিল।

ওল্ড ফাদার তার ঠোটে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়ে বলল, ‘যে অন্যের জন্যে কাঁদতে পারে, হাসতে পারে, সে মানুষের মধ্যে মহত্তম মানুষ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন বৎস’। বলেই চোখ বন্ধ করল ওল্ড ফাদার। বলল, ‘এস তোমরা’।

জিনা ও ফ্রান্সিস দু’জনেই ওল্ড ফাদারকে বাও করে বেরিয়ে এল কক্ষ থেকে।

জিনা ফ্রান্সিসের হাত ধরে হাঁটছিল। হাঁটতে হাঁটতে হাতে চাপ দিয়ে বলল, ‘তোমার ধর্মে বাও করা নেই, বাও যে করলে আবার?’

‘আমি তো জানিনা জিনা, আমার ধর্মে কিভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাতে হয়’।

‘এবার তো খুশী! তোমার ধর্মকে ওল্ড ফাদার মহত্তম ধর্ম বলেছেন!’

‘আরেকজন মানুষকেও ফাদার মহত্তমদের একজন বলেছেন’।

জিনার মুখ লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। কথা বলল না।

ফ্রান্সিস জিনার হাতকে আরও শক্ত করে ধরে বলল, ‘আজ আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। আমি আজ দুই ‘মহত্তম’-এর মালিক’।

‘দুই ‘মহত্তম’?’ মুখ না তুলেই লজ্জা রাঙা মুখে বলল জিনা।

‘হ্যাঁ দুই ‘মহত্তম’। একটা আমার ধর্ম, অন্যটা আমার তুমি’।

জিনা তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, ‘আমার মালিকানা তোমাকে দিয়ে দিয়েছি বুঝি?’

‘এই তো এক্ষুণি ওল্ড ফাদারের কাছে কাদো কাদো ভাবে কি বললে?’

‘যা বলেছি, ওল্ড ফাদারকে বলেছি। তোমাকে তো বলিনি!’

‘গীর্জা থেকে বেরুবার পর বললে না যে, আমি অপবিত্র হলে, তুমিও অপবিত্র? বলনি যে, আমি গীর্জায় যেতে না পারলে তুমিও যাবে না?’

‘ওটা তো সমবেদনা’।

‘সেদিন কলেজ-ফেস্টিভ্যালে আমার সাতে জোড় না হওয়ায় তুমি নাচনি। কেন বলব?’

‘তুমি নাচনি কেন?’

‘তোমার সাথে জোড় না হওয়ায় নাচিনি। কারণ তুমি আমার’।

জিনা কোন উত্তর দিল না।

‘তোমার উত্তরটা দাও’। চাপ দিল ফ্রান্সিস।

জিনা ফ্রান্সিসের হাত আবার হাতে তুলে নিয়ে বলল, ‘জবাব দেব না’।

‘জবাব দরকার নেই’।

‘কেন?’

‘হাতটা হাতে তুলে দেবার পর আবার মুখের জবাব কি দরকার’।

‘আচ্ছা, এই কথা’। বলে হাত খুলে নিয়ে দৌড় দিল জিনা।

‘শোন, শোন জিনা, কথা আছে’। ডাকল ফ্রান্সিস।

‘এখন নয়, বিকেলে দেখা হবে’। চিৎকার করে বলল জিনা।

‘জরুরী কথা। তুমি না শুনলে আমি এখানেই বসে থাকব সারাদিন’। বলে রাস্তার উপরেই বসে পড়ল ফ্রান্সিস।

দাড়িয়ে পড়ল জিনা। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ফ্রান্সিসের কাছে।

জিনা ফ্রান্সিসের কাছে হাটু গেড়ে বসে অভিমান ক্ষুব্ধ কন্ঠে বলল, ‘তুমি জান তোমাকে এভাবে রেখে আমি যেতে পারব না, তাই তোমার এই জেদ!’

‘মাফ কর জিনা। তোমাকে সত্যিই আমার প্রয়োজন। আজ মা’র সাথে আমি ঝগড়া করব তিনি কেন আমাকে অন্ধকারে রেখেছিলেন। তুমি আমার সাথে থাকবে’।

জিনা একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, ‘ঠিক আছে যাব। কিন্তু ঝগড়া কেন? ওল্ড ফাদার যা জানেন, তোমার আম্মাও তা জানবেন, এটা তুমি জানলে কি করে?’

ফ্রান্সিস উঠে দাড়াতে দাড়াতে বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ জিনা। তোমাকে এই জন্যেই তো প্রয়োজন'।

জিনাও উঠে দাড়িয়েছিল।

দু'জন হাটতে শুরু করল ফ্রান্সিসের বাড়ির দিকে।

'একই পাড়া অর্থাৎ একই পাহাড়ে জিনা ও ফ্রান্সিসের বাড়ি। জিনাদের বাড়ি পাহাড়ের পূর্ব প্রান্তে, আর ফ্রান্সিসদের বাড়ি পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে।

ছোট্ট দু'তলা বাংলো বাড়ি ফ্রান্সিসদের। এ তুলনায় জিনাদের বাড়ি বলা যায় প্রাসাদ।

উপত্যকায় ফ্রান্সিসদের কয়েকখন্ড জমি আছে। এটাই তাদের আয়ের প্রধান উৎস। এছাড়া তুরস শহরে ফ্রান্সিসের আব্বা একটা ফ্যাক্টরী চালাত। সেটা এখনও আছে। তা থেকেও আয় আসে। সব মিলিয়ে ফ্রান্সিসরা ধনী না হলেও স্বচ্ছল পরিবার।

ফ্রান্সিস তার পিতা-মাতার একমাত্র ছেলে। বাড়িতে তার আম্মা এবং কয়েকজন কাজের লোক ছাড়া কেউ নেই।

বাড়িতে পৌছে ফ্রান্সিস তার আম্মাকে তার আম্মার ঘরে খুজে পেল।

ফ্রান্সিস এবং জিনা ঘরে ঢুকতেই ফ্রান্সিসের মা মরিয়ম মার্গারেটা বলল, 'দু'জন কোত্থেকে আসা হচ্ছে? গীর্জা?'

'হ্যাঁ, চাচী আম্মা'। জবাব দিল জিনা।

ফ্রান্সিস গম্ভীর।

'ফ্রান্সিস গীর্জার রেগুলার সদস্য হয়ে গেল নাকি? লক্ষণ ভাল নয় তো!' হেসে বলল ফ্রান্সিসের মা।

'তার যাওয়াটা দেখা ছাড়া আর কিছু নয় চাচী আম্মা। চুপ করে বসে থাকে। কিছুই করে না'।

ফ্রান্সিসের গম্ভীর মুখের দিকে তার মা'র দৃষ্টি এতক্ষণে নিবদ্ধ হলো চুপ করে থাকা দেখে। একটু বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে বলল, 'কথা বলছিস না যে। মুখটা ভারি দেখছি। কারো সাথে ঝগড়াঝাটি করেছিস নাকি?'

'না আম্মা ঝগড়া করিনি'। গম্ভীর কন্ঠে কথাগুলো বলে কয়েক ধাপ এগিয়ে মাকে চেয়ারে বসিয়ে নিজে তার পাশে বসে বলল, 'তোমার সাথে কথা আছে আম্মা'।

'এত আয়োজন করে কি কথা বলবিরে মা'কে?'

'তোমার সাথে ঝগড়া আছে আম্মা?' গম্ভীর কন্ঠে বলল ফ্রান্সিস।

ফ্রান্সিসের মা মরিয়ম মার্গারেটা মুখ টিপে হাসল। বলল, 'খুব বড় ঝগড়া বুঝি! তাই জিনাকে এনেছিস বুঝি সাহায্যের জন্যে?'

ফ্রান্সিসের মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'জিনাকে আমি ডাকব সাহায্যের জন্যে! কথা বলার আগেই তো সে তোমার পক্ষ নেবে। দেখো এখনি গিয়ে সে তোমার পেছনে দাড়িয়েছে'।

সত্যিই ফ্রান্সিসের মা মরিয়ম মার্গারেটা চেয়ারে বসলে জিনা গিয়ে চেয়ারের পেছনে দাড়িয়ে পেছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরে আছে ফ্রান্সিসের মা'র।

ফ্রান্সিসের মা জিনার হাত ধরে সামনে টেনে এনে কোলে বসিয়ে চিবুকে একটা চুমু খেয়ে ফ্রান্সিসের দিকে চোখ রাঙিয়ে বলল, 'চুপ, জিনার সাথে ঝগড়া বাধাব না বলছি'।

'ও কথা আমাকে না বলে ওকেই তোমার বলা দরকার আম্মা। ঝগড়া ওই-ই বাধায়। বাইরে বেরুলেই মনে হয় ও বুঝি তোমার কাছ থেকে গভর্নরশীপ নিয়েছে'।

'চাচীমা দেখুন, ঝগড়া কে বাধায়?' জিনা ফ্রান্সিসের মা'র কোল থেকে উঠে আবার তার চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল এবং গলা জড়িয়ে ধরে ফ্রান্সিসের মা'র কাধে মুখ রাখল।

ফ্রান্সিস কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার মা বাধা দিয়ে বলল, 'থাক ঝগড়াটা আমার সাথেই কর'।

ফ্রান্সিস চুপ করল। মাথা নিচু করে রাখল একটুক্ষণ।

তারপর মাথা তুলে গম্ভীর কন্ঠে বলল, 'আম্মা, তুমি আমার গীর্জায় যাওয়ার কথা তুলেছ। কিন্তু গীর্জায় যেতে কখনও বাধা দাওনি। কখনও বলনি আমাদের পৃথক গীর্জা আছে কিনা'।

ফ্রান্সিসের মা'র মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। উত্তর দিল না সঙ্গে সঙ্গেই। অল্পক্ষণ পর বলল, 'আমাদের তো কিছু নেই বাছা, কিসের কথা তোমাকে বলব, কোথায় তোমাকে যেতে বলব। ব্যথায় হাত দিলে ব্যথা আরও বাড়ে। আমি চাইনি কখনও ব্যথা বাড়াতে'।

'কি নেই আমাদের? সবই তো আছে। আমাদের অতীত আছে, আমাদের বর্তমানও আছে'।

'আছে। কিন্তু আমাদের ফ্রান্সের মুসলমানদের কি আছে?' থাকলে তোকে গীর্জায় যেতে হতো না, মসজিদে যেতিস'।

'মসজিদ কি আম্মা?' উৎসুক্য ফুটে উঠল ফ্রান্সিসের চোখে।

'মুসলমানরা যেখানে দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করে এবং যেখানে প্রতি শুক্রবার সকলের উপস্থিতিতে বিরাট প্রার্থনা সমাবেশে প্রার্থনা এবং সমসাময়িক বিষয়ের উপর বক্তৃতা হয়'।

'আমি তো এই মসজিদ কোথাও দেখিনি। তুরস, নানতেজ, আজার- এসব শহরেও মুসলমান দেখেছি। কিন্তু মসজিদ তো দেখিনি?'

'এটাই তো বেদনার কাহিনী ফ্রান্সিস। আমরা আমাদের ভুলে গেছি, ভুলতে বাধ্য করা হয়েছে'।

থামল মরিয়ম মার্গারেটা। বেদনার ছায়া নেমেছে তার সমগ্র মুখ জুড়ে। চেয়ারে একটু হেলান দিয়ে কথা শুরু করল আবার, 'তোর আব্বার কাছ থেকে শুনেছি। এই পশ্চিম ও দক্ষিণ ফ্রান্সে চারশ' বছর আগেও প্রচুর মুসলমান ছিল। তাদের হয় হত্যা করা হয়েছে, নয়তো দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, অথবা তাদের মুসলিম পরিচয় বিলুপ্ত করতে বাধ্য করা হয়েছে। তোমার আব্বা বলেছেন, তোমার পূর্ব পুরুষ, আমাদের নবী মোহাম্মদ (স)-এর দেশ আরবের অধিবাসী ছিলেন। সেনাধ্যক্ষ হিসেবে দেশ জয়ে এসে তোমার এক পূর্ব পুরুষ আলজিরিয়ায় থেকে যান। সেই মুসলিম দেশ আলজিরিয়ায় যখন অষ্টাদশ শতকে ফরাসিরা উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন হাজার হাজার মুসলমানের সাথে তোমার এক পূর্ব পুরুষকেও ফ্রান্সে ধরে আনা হয়। সেই হতভাগ্য ছিলেন তোমার দাদার আব্বা। এদেরকে ধরে এনে শুধু বাধ্যতামূলক শ্রমেই লাগানো হয় না, এদের ধর্মীয়

পরিচয়ও বিলুপ্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়। সুতরাং মসজিদ গড়ে উঠবে কি করে? কি করে দেখবি তুই আজ মসজিদ? মসজিদ কেন, তুই কি তোর ধর্মগ্রন্থ চোখে দেখেছিস? দেখিসনি প্রতিদিন পাঁচবার প্রার্থনা করা মুসলমানদের জন্যে বাধ্যতামুলক। তুই কি প্রার্থনা করতে পারিস? জানিস কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়? আমি জানিনা, তোর আব্বাও জানতেন না, তুইও জানিস না। সুতরাং আমাদের কি আছে? কিছুই নেই'।

থামল ফ্রান্সিসের মা। তার চোখ থেকে দু'ফোটা অশ্রু নেমে এসেছিল।

ফ্রান্সিসেরও চোখ-মুখ আবেগে ভারি হয়ে উঠেছে। ছল ছল করে উঠেছে তার চোখও। সে কামড়ে ধরেছে তার ঠোঁট। তার পূর্ব পুরুষ নবীর দেশ আরবের মানুষ এই কথা হৃদয়কে তার তোলপাড় করে তুলেছে। তার পূর্ব পুরুষের দুর্ভাগ্য, তার জাতির দুর্ভাগ্য, তার হৃদয়ে হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে। তার আম্মা থামলে ফ্রান্সিস বলল, 'আম্মা, তুমি দেখনি আমাদের ধর্মগ্রন্থ? কিংবা আব্বা?'

'না বেটা, উনি দেখলে হয়তো আমিও দেখতে পেতাম'। চোখ মুছে বলল ফ্রান্সিসের মা।

'আমাদের প্রার্থনা শেখার কি কোন উপায় নেই আম্মা? তোমরা কি কোনই চেষ্টা করনি?'

'তোর আব্বা ছোট একটা বই জোগাড় করেছিলেন। যাতে প্রার্থনার কথা বলা আছে, ধর্মের শিক্ষা সম্পর্কেও সংক্ষেপে বলা আছে। কিন্তু প্রার্থনার বিস্তারিত নিয়ম কিছু নেই। তাছাড়া প্রার্থনার মধ্যে ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ অপরিহার্য। সুতরাং ধর্মগ্রন্থের কিছু মুখস্থ না থাকলে তো প্রার্থনাই হয় না'।

তার আব্বার বইয়ের কথা শুনে ফ্রান্সিসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তার আম্মা থামতেই বলল, 'সেই বইটি কোথায় আম্মা?'

'তোর আব্বার বাক্সে আছে'।

'দেখাও না আম্মা'।

'দেখতে চাইলে কাপড় ছেড়ে পরিস্কার কাপড় পরে আসতে হবে এবং ওজু করতে হবে'।

'ওজু কি?'

‘তোর দাদীর কাছে এটা শুনেছি। ‘ওজু’ মানে হাত, মুখ, মাথা ও পা পানি দিয়ে ধোয়া। এর একটা নিয়ম আছে যা আমরা জানি না। আমরা এসব এমনি ধুয়ে বইটি হাতে নিয়েছি’।

‘ঠিক আছে, আমি কাপড় বদলে এবং হাত মুখ মাথা ধুয়ে আসছি’।

ফ্রান্সিসের মা’ও উঠে গেল কাপড় বদলাতে এবং ওজু করতে।

বাক্সের ভেতর আরেকটি সুন্দর কাগড়ে মুড়ে বইটি রাখা। ফ্রান্সিসের মা মরিয়ম মার্গারেটা বইটি হাতে তুলে নিয়ে টেবিলে বসল। টেবিল ঘিরে আরও চেয়ারে বসল ফ্রান্সিস এবং জিনা।

ফ্রান্সিসের মা কাগজের মোড়ক খুলে চুমু খেল বইটিকে।

‘বইটি ধরার জন্যে পরিস্কার কাপড় এবং ওজু করা শর্ত কেন আম্মা?’

‘এই বইটি ধরার জন্যে এ সব শর্ত নেই। বইটি প্রাথমিক ধরণের, খুব গুরুত্বপূর্ণ বই নয়। কিন্তু এই বইতে আমাদের ধর্মগ্রন্থের ভাষায় ধর্মগ্রন্থের হরফে, ধর্মগ্রন্থের কিছু উদ্ধৃতি আছে। ধর্মগ্রন্থ এবং ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি যুক্ত বই স্পর্শ করতে হলে ঐ সব শর্ত পালন করতে হয়’।

বইটির পাতার সংখ্যা ৫০-এর মত হবে। নাম, ‘বেসিক বিলিফস ইন ইসলাম’।

বইটির শিরোনাম-পাতার পরই প্রথম পাতার শুরু আরবীতে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ লেখার মাধ্যমে। তারপর আরবীতেই দুই লাইন আল্লাহর প্রশংসা এবং নবী (স)-এর প্রতি শান্তি বর্ষণমূলক দোয়া লেখা রয়েছে আরবীতে।

ফ্রান্সিসের মা লেখাগুলোকে চুমু খেয়ে বলল, ‘এগুলো ধর্মগ্রন্থের অংশ’।

ফ্রান্সিসও চুমু খেল ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতিতে। চুমু খেতে গিয়ে তার চোখ ছল ছল করে উঠল।

গোটা বইতে আরও ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি আছে, সেগুলোও দেখাল ফ্রান্সিসকে।

‘উদ্ধৃতিগুলো তো পড়তে পার না আম্মা’।

‘না ফ্রান্সিস, তোর আব্বাও পারত না। প্রথমেই যে উদ্ধৃতি দেখছ, তোমার আব্বাই বলেছেন মুসলমানদের প্রত্যেক কাজের আগেই এটা পড়তে হয়’।

‘কথাটা কি আম্মা?’

‘আমি জানি না। ইংরেজিতে অর্থ লেখা আছে’।

‘আমি তো ইংরেজী জানি না, তুমি তো কিছু জান। পড়ে শোনাও না আম্মা’।

‘তোর আব্বার কাছে অল্প অল্প শিখেছি’। বলে ফ্রান্সিসের মা কোন রকমে বিসমিল্লাহর অর্থ বলে দিল।

‘সুন্দর কথা তো আম্মা। ধর্মগ্রন্থের ভাষা জানি না, এই কথা ফরাসী ভাষায় বললে হবে না?’

‘আমি জানি না বাছা। ধর্মের কোন নিয়ম কানুন বলা তো আমার সাজে না’।

‘আমার মনে হয় আমাদের ওল্ড ফাদার তোমাদের ধর্মগ্রন্থের এই উদ্ধৃতি পড়তে পারবেন’। বলল জিনা।

‘জিনা ঠিক বলেছে আম্মা। ফাদার আজ বলেছেন, তিনি আমাদের ধর্মগ্রন্থ পড়েছেন’। বলল ফ্রান্সিস সোৎসাহে।

‘কিন্তু বইটা তো তোর আব্বা অন্য কারও হাতে দিতেন না। আমিও দিতে পারবো না’। বলল ফ্রান্সিসের মা।

ফ্রান্সিসের মা বইটির পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা সুন্দর রঙীন ছবি বেরিয়ে পড়ল।

‘কিসের ছবি আম্মা ওটা?’ ফ্রান্সিস অনেকটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল ছবির উপর।

‘মুসলমানদের গীর্জা অর্থাৎ মুসলমানদের কয়েকটা বিশ্ববিখ্যাত মসজিদের ছবি দেয়া আছে বইতে। প্রথম এই মসজিদটা মক্কার কা’বা শরীফ’।

‘মক্কার কা’বা শরীফ? যেখানে হজ্জ করতে হয়, যেখানে নবী (স)-এর জন্ম?’

‘হ্যাঁ, এ সেই’।

ফ্রান্সিস গভীর আবেগে চুমু খেল কা’বা শরীফকে এবং বলল, ‘মদিনার মসজিদ নেই আম্মা?’

‘হ্যাঁ আছে’। বলে পাতা উল্টাল ফ্রান্সিসের আম্মা। পরের পৃষ্ঠাতেই মসজিদে নব্বী।

ফ্রান্সিস এ মসজিদকেও চুমু খেল এবং বলল, ‘আম্মা এখানেই আমাদের নবী (স)-এর কবর’। বলতে গিয়ে আবেগে ভারি হয়ে উঠল ফ্রান্সিসের গলা।

‘তুই এত কথা জানলি কোত্থেকে, কেমন করে?’ বলল ফ্রান্সিসের মা।

‘মক্কার কা’বা শরীফ-এর নাম শুনেই বহু আগের এ কথাগুলো হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেছে মা। চার বছর আগে তুরস-এর একটা লাইব্রেরীতে একটা বই দেখেছিলাম। তার নাম ছিল ‘পূর্বদেশীয় ধর্মীয় স্থানসমূহ’। অনেক সময় ধরে সেদিন লাইব্রেরীতে বসেছিলাম। সেই সময়ে এ দু’টি স্থানের বিবরণও পড়েছিলাম। কিন্তু তখন এতটা বুঝিনি’।

শেষ পাতায় গিয়ে ফরাসী ভাষায় হাতের লেখা কয়েকটা বাক্যের প্রতি এক সাথেই গিয়ে নজর পড়ল ফ্রান্সিস এবং তার মা’র।

লেখাটা ছিল একটা নাম। নামটা হলো, ‘ফ্রান্সিস আবু বকর’।

লেখাটা পড়েই ফ্রান্সিস বলল, ‘এটা তো আব্বার হাতের লেখা’। কি লিখেছেন আম্মা?’

লিখাটা দেখেই আনমনা হয়ে পড়েছিল ফ্রান্সিসের না মরিয়ম মার্গারেটা। ধীরে ধীরে তার চোখ বুজে গিয়েছিল।

ফ্রান্সিস এবং জিনা কারোই তা নজর এড়ালো না।

‘কি হলো আম্মা? অসুস্থবোধ করছ?’ ফ্রান্সিস জিজ্ঞাসা করল উদ্বিগ্ন কন্ঠে।

চোখ খুলল ফ্রান্সিসের মা। তার চোখ দু’টো ভারি। বলল, ‘না কিছু হয়নি বেটা। লেখাটা আমাকে অনেক দুর অতীতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল’।

থামল ফ্রান্সিসের মা। মাথা নিচু করে একটু দম নিল যেন। তারপর আবার শুরু করল, ‘তখন তুই আমার পেটে। বইটা পড়া যেদিন শেষ করল তোর আব্বা বলল, আমাদের যদি ছেলে সন্তান হয়, তাহলে তার নাম রাখব ‘ফ্রান্সিস

আবুবকর’। বলে তিনি নামটা এখানে লিখে রাখলেন। তুই হওয়ার পর এই নামই তোমার রাখা হয়’।

‘আমার নাম তাহলে ফ্রান্সিস আবুবকর?’

‘হ্যাঁ বেটা। স্কুলে যখন তোকে দিলাম, তারা ‘আবুবকর’ বাদ দিয়ে লিখল ‘বুবাকের’। সেই থেকে তুই হয়ে গেছ ফ্রান্সিস ‘বুবাকের’। নামটা রেখেও আমরা ঐ নামে ডাকতে পারিনি’।

‘কেন?’

‘আবুবকর নামটা এতটাই পরিচিত যে, এখানকার স্কুল-কলেজ একে ভালো চোখে দেখে না। তাছাড়া এই নামে তুই পরিচিত হলে, আমরা ভয় করেছি, তোর কোন ক্ষতি হতে পারে। বিপদে পড়তে পারিস মাঝে মাঝেই’।

‘আবুবকর নামটা পরিচিত কেন আম্মা?’

‘আবুবকর হলেন আমাদের নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাথী। নবী (স)-এর মৃত্যুর পর তিনিই নবীর প্রতিনিধি বা ‘ধর্মনেতা’র পদে আসীন হন এবং ইসলামী জগতের শাসকও হন তিনি। তাঁর কাছেই রোমান সম্রাটের বাহিনী প্রথম পরাজয় বরণ করে এবং বিশাল এলাকাও হারায় তার কাছে’।

ফ্রান্সিস-এর চোখ দু’টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গর্বে ভরে উঠল তার মন। নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাথী এবং এতবড় মহান লোকের নামে তার নাম।

ফ্রান্সিস সোজা হয়ে বসে বলল, ‘এই নাম রাখার জন্যে তোমাকে এবং আব্বাকে ধন্যবাদ আম্মা’।

তারপর জিনার দিকে ফিরে বলল, ‘নামটা পছন্দ হয়? আমাকে কিন্তু এই নামেই ডাকবে’।

‘বড় নাম শুধু নিলে হবে না, বড় কাজও করতে হবে’। বলল জিনা।

‘তুমি সে বড় কাজের সাথী হবে’।

জিনার মুখ লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। উঠে দাঁড়াল সে। বলল, ‘চাচী আম্মা, আমি আসি’। বলে ঘুরে দাড়িয়ে হাঁটা শুরু করল।

কথাটা বলে কিন্তু ফ্রান্সিস জিব কেটেছিল। তার মা’র সামনে জিনাকে এই কথা বলা ঠিক হয়নি। কথাটা বলে লজ্জা পেয়েছিল ফ্রান্সিস নিজেও।

'জিনাকে এভাবে যখন তখন রাগাও কেন?' বকুনির স্বরে বলল ফ্রান্সিসের মা।

'জিনা শোন, শোন জিনা'। বলে ডাকতে ডাকতে ফ্রান্সিসও বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে জিনাকে দেখতে পেল না ফ্রান্সিস। ভাবল, নিশ্চয় দৌড়ে পালিয়েছে। বাড়ির গেটে গিয়েও দেখতে পেল না তাকে। হঠাৎ তার মনে হল জিনা নিশ্চয় লুকিয়েছে।

ফিরতে যাবে এমন সময় পিঠে এসে একটা কিল পড়ল। ফিরে দাড়ানোর আগেই দেখল ছুটে পালাচ্ছে জিনা। চিৎকার করে বলছে, 'আজকের মত মাফ করে দিলাম'।

'কিলটা তাহলে কিন্তু বাড়তি হয়ে থাকল। পিঠটা রেডি রেখ'। চিৎকার করে বলল ফ্রান্সিস।

'ঠিক আছে'।

ছুটে চলে গেল জিনা।

যতক্ষণ তাকে দেখা গেল তাকিয়ে রইল ফ্রান্সিস। তার চোখে স্বপ্ন। সুন্দর, পবিত্র এক স্বপ্ন।

চোখ খোলার আগেই আহমদ মুসা অনুভব করল সে নরম বিছানায় শুয়ে। তার মনে পড়ল, সে গাড়ি চালাচ্ছিল, গাড়ির নিয়ন্ত্রণ সে রাখতে পারছিল না। তারপর আর কিছু মনে নেই তার। গাড়ি কি এ্যাকসিডেন্ট করেছিল?

সে এখন কোথায়, ভাবল আহমদ মুসা। ব্ল্যাক ক্রস-এর হাতে সে ধরা পড়েনি তা বুঝা যাচ্ছে এই নরম শয্যা দেখে। তাহলে সে কোথায়? গাড়ি থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কেউ তাকে অবশ্যই তুলে এনেছে। তারা কারা? ব্ল্যাক ক্রস-এর কেউ নয়তো? ঐ ট্যাক্সির ড্রাইভার যদি ব্ল্যাক ক্রস-এর লোক হয়, তাহলে যে কেউ তা হতে পারে।

সে কি হাসপাতালে? বিছানার যে বৈশিষ্ট সে অনুভব করছে এবং নাকে যে গন্ধ আসছে, তাতে বুঝা যাচ্ছে এটা কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকের কক্ষ।

চোখ খুলে সে কাকে দেখতে পাবে?

ধীরে ধীরে চোখ খুলল আহমদ মুসা। চোখ খুলে আহমদ মুসা দেখতে পেল একজন নার্সকে। আহমদ মুসাকে চোখ মেলতে দেখে এগিয়ে এল নার্স।

ঘরের অন্যপাশে চেয়ারে বসা একজন তরুনীকে দেখতে পেল। তরুনীটি আহমদ মুসাকে তাকাতে দেখেই উঠে দাড়াল। মেয়েটির চোখে-মুখে আনন্দ, বিস্ময় এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা।

আহমদ মুসা চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাকাল নার্স-এর দিকে। বলল, 'নার্স, দয়া করে বলবেন কি আমি কোথায়?'

'আপনি দ্বিজন গ্রামের একটি ক্লিনিকে'। বলল নার্স।

'এই দ্বিজন গ্রাম কোথায়?'

'নানতেজ-তুরস হাইওয়ের পাশে এদরে নদীর তীরে এবং তুরানে উপত্যকার মাথায় এই গ্রাম।

'আজ কয় তারিখ এবং কি বার নার্স?'

নার্স জবাব দিল। তারপর বলল, 'আপনি কেমন বোধ করছেন?'

'ভালো'।

'আপনাকে যারা এনেছেন এবং সবকিছু করছেন, আপনি তাদের সাথে কথা বলুন' বলে নার্স চেয়ার থেকে দাড়িয়ে পড়া মেয়েটিকে কাছে ডেকে নিয়ে আহমদ মুসাকে বলল, 'এ হলো জিনা লুইসা। এর আব্বা মিঃ ফ্রাংক মরিস। এদের পরিবার পিকনিকে গিয়েছিলেন 'সুর লোরে'-এর এক পাহাড়ে। আপনাকে আহত ও সংজ্ঞাহীন পেয়ে তারা আপনাকে নিয়ে এসেছেন তাদের গ্রামের এই ক্লিনিকে'।

কথা শেষ করেই নার্স আবার বলল, 'আপনারা কথা বলুন, আমি ডাক্তারকে খবর দেই'।

বসে নার্স বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে।

'ধন্যবাদ বোন। আপনাকে বোন বললে কি আপত্তি করবেন?'

জিনার কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব এখনও যায়নি। এই অপরিচিত ও বিস্ময়কর লোকটির সাথে কিভাবে কথা বলবে, কি কথা বলতে হবে, ইত্যাদি নিয়ে তার ভয়, দ্বিধা, সংকোচ এখনও কাটেনি।

আহমদ মুসা বোন ডেকে ধন্যবাদ দিলে উজ্জ্বল হয়ে উঠল জিনার চোখ। জিনা অনুভব করল, লোকটির কন্ঠে কৃত্রিমতা নেই, আর চোখে তার পবিত্র দৃষ্টি। জিনার মনে পড়ল, ওল্ড ফাদারের চোখে এই পবিত্র দৃষ্টি সে দেখেছে। এ দৃষ্টি শত্রুকে মিত্র করে, দুরের মানুষকেও আপন করে নেয়।

জিনা মাথা নেড়ে জানাল, না তার আপত্তি নেই। তারপর জিনা বলল, 'আমি আব্বা-আম্মাকে খবর দেই, তারা খুশী হবেন'।

বলে জিনা ঘুরে দাড়াতে গেল।

'শুনুন বোন'। ডাকল আহমদ মুসা।

জিনা থমকে দাড়াল।

'নার্স যে পিকনিকের কথা বললেন, সেটাতে আপনি ছিলেন?'

'জি, কেন?'

'আমি যে গাড়িতে ছিলাম, সে গাড়ি কি ভেঙ্গে গেছে বা তার ক্ষতি হয়েছে?'

'জি না। ও গাড়ি ড্রাইভ করেই আব্বা ও আমি আপনাকে নিয়ে পাহাড়ের এপাশে আমাদের গাড়ির কাছে এসেছিলাম। কেন বলছেন গাড়ির কথা?'

'আমি গাড়িটা এক ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিলাম। গাড়ি ভেঙ্গে গেলে লোকটির অনেক ক্ষতি হবে'।

বিস্মিত হলো জিনা। লোকটা তার এই বিপদে নিজের কথা না ভেবে ভাবছে দরিদ্র ট্যাক্সি ড্রাইভারের ক্ষতির কথা। যে বিপদ থেকে তিনি বেচেছেন, যে অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি পড়েছেন, তাতে ট্যাক্সি কেন উড়োজাহাজের ক্ষতির কথাও এই মুহুর্তে তার মনে আসার কথা নয়। আশ্চর্য লোক তো!

হঠাৎ ওল্ড ফাদারের কথা মনে পড়ল, 'যারা অন্যের হাসিতে হাসে, অন্যের কান্নায় কাদে, তারা মানুষের মধ্যে মহত্তম'।

জিনা শ্রদ্ধার সাথে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। নব্বই বছরের শুদ্ধ ধর্মনেতার জ্ঞান ও দৃষ্টি যে নব্য যুবকটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সে কে?- এই প্রশ্নটি আবারও মাথা তুলল জিনার মনে।

বলল জিনা, 'গাড়িটা ভাল আছে। দুর্ঘটনার স্থান থেকে গাড়ি দুরে থাকায় নিরাপদেই থাকবে'।

এই সময় এক সাথে ঘরে প্রবেশ করল, জিনার আব্বা, আম্মা এবং ছোট ভাই।

জিনা বলে উঠল, 'আমি যাচ্ছিলাম তোমাদের খবর দিতে। কি করে খবর পেলে?'

'নার্স টেলিফোন করেছে'।

জিনা তার আব্বা, আম্মা ও ছোট ভাই এর পরিচয় দিল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা উঠে বসতে বসতে বলল, 'আমি নার্স ও জিনা বোনের কাছে কিছু শুনেছি। আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আপনারা আমাকে বাঁচতে সাহায্য করেছেন'। অত্যন্ত নরম কন্ঠস্বর আহমদ মুসার।

আহমদ মুসাকে উঠতে বাধা দিয়ে জিনার আব্বা ফ্রাংক মরিচ বলল, 'ঈশ্বরই সব কিছু করেন, মানুষ নিমিত্ত মাত্র। তুমি এখন কেমন বোধ করছ?'

'ভাল'।

'আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলে এলাম। কোন কমপ্লিকেসি নেই। এখনই তোমাকে আমরা নিয়ে যেতে পারি'।

'আপনাদের কষ্ট দেয়া হবে। সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ক্লিনিকেই থাকতে পারি কিনা। কিছু মনে করবেন না। এখানে সিটরেন্ট কত?'

'সিটরেন্টের প্রশ্ন নেই। এটা আমার ভাইয়ের ক্লিনিক। বাড়িতে নিলে তুমি ভাল থাকবে'।

আহমদ মুসা কিছু না বলে মুখ নিচু করল।

জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক তার ছেলে মার্ক-এর দিকে তাকিয়ে বলল, দেখ, এ্যাম্বুলেন্স রেডি কিনা। ওদের আসতে বল'।

জিনার আম্মা এ সময় একশ' ডলারের কয়েকটা নোট আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'বাছা, এ টাকাগুলো তোমার জুতার মধ্যে পাওয়া গেছে'।

লজ্জার একটা ছায়া নামল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। বলল, 'আমার তো রাখার কিছু নেই, ওগুলো কি আপনার কাছে থাকতে পারে না?'

জিনার মা'র মুখ প্রসন্নতায় ভরে গেল। বলল, 'ঠিক আছে বাছা'।

জিনাদের বাড়িতে এল আহমদ মুসা।

তাদের ফ্যামিলি গেস্টরুমের একটা সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে তাকে থাকতে দেয়া হলো। প্রতিদিন ডাক্তার এসে তাকে একবার দেখে যায়। জিনা এবং মার্ক তার দেখাশুনা করে।

আহমদ মুসা ঠিক করেছে তার মুসলিম পরিচয় আপাতত গোপন রাখবে। ব্ল্যাক ক্রস-এর লোকেরা সুর লোরের চারপাশে ঘুর ঘুর করতে পারে। ওদের তো পাগল হয়ে ওঠার কথা। একদিকে সে আহত, তার উপর তার মুসলিম পরিচয়ের প্রকাশ তার পরিচয় প্রকাশ করে দিতে পারে। ঘরে গোপনে সে নামায পড়ে।

সেদিন ভোর পাঁচটার সময় জিনা ও মার্ক বেরিয়েছে তুরস যাবার জন্যে। ছয়টায় তুরসে তাদের একটা প্রোগ্রাম আছে।

আহমদ মুসার রুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় মধুর সুরেলা কন্ঠ শুনে দু'জনেই থমকে দাঁড়াল। কান পেতে শুনল সুরটা আহমদ মুসার রুম থেকেই আসছে। দু'জনেরই তীব্র কৌতুহলের সৃষ্টি হলো।

জিনা গিয়ে দরজা বন্ধ কিনা তা দেখার জন্যে ধীরে ধীরে চাপ দিল। দরজা আস্তে আস্তে ফাঁক হয়ে গেল।

ঘরের দরজা পশ্চিম দিকে। দরজা ফাঁক হলে তারা দেখল আহমদ মুসা কার্পেটের উপর একটা পরিষ্কার তোয়ালে ফেলে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে মুখ করে দাড়িয়ে আছে তার হাত দু'টি বুকে বাঁধা। সুর করে দুর্বোধ্য ভাষায় অনুচ্চ স্বরে কি যেন পড়ছে। তারপর তারা আহমদ মুসাকে কোমর পর্যন্ত খাড়া রেখে ভাঁজ হতে দেখল। দেখল, কার্পেটের উপর কপাল রেখে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়তে। মাঝখানে একবার বিরতি দিয়ে চার বার তাকে তারা একই কাজ করতে দেখল।

সবশেষে দেখল দু'হাত তুলে প্রার্থনা করতো।

দরজা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে জিনা ও মার্ক বেরিয়ে এল। মার্ক বলল, 'আপা, তুমি অবাক হচ্ছো! আমি আরও দু'বার তাকে এই কাজ করতে দেখেছি'।

'কোন সময় দেখেছিস?'

'দু'দিনই দেখেছি রাত দশটার পরে'।

'এমন ধরণের শরীরচর্চা তো কোথাও দেখিনি'।

'শরীরচর্চার পরে ঐ প্রার্থনাও তো অবাক ব্যাপার?'

'কিন্তু এই শরীরচর্চা এমন সময়ে এবং বন্ধ ঘরে গোপনে কেন? তাছাড়া ঐ সব কি পাঠ করেন উনি?'

'আসলে কিন্তু খুবই মজার ঘটনা আপা'।

'ঠিক। একদিন জিজ্ঞাসা করতে হবে'।

সেদিন জিনাদের ফ্যামিলি ড্রইং রুমে জিনা, তার আব্বা, মা এবং ভাই মার্ক বসে।

কথা বলছিল জিনার মা। বলছিল, 'শোন জিনার আব্বা, এই মুসায়েভ ছেলেটাকে না দেখলে আমার বিশ্বাসই হতো না এমন মানুষ দুনিয়াতে থাকতে পারে। এত লাজুক যে অধিকাংশ সময়ই মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না, আমাদের মানে মেয়েদের সাথে। জিনাকে সে বোন ডেকেছে, কিন্তু জিনার মুখের দিকে তাকে তাকাতে দেখিছি বলে আমার মনে পড়ে না'।

'ঠিক বলেছ, আম্মা। আমার মাঝে মাঝে কিন্তু হাসি পায়'।

'শুধু জিনা ও আমার ক্ষেত্রেই নয়, পাড়ার মেয়েরাও এসেছে। তাদের কেউ সামনে এলেই সে চোখ নামিয়ে নেয়'।

'আমিও এটা লক্ষ্য করেছি। প্রথম দিকে ভাবতাম, এটা তার এক ধরনের নার্ভাসনেস। সুন্দরী ও সমবয়সী মেয়েদের সামনে পড়লে অনেকের এমন হয়। কিন্তু আহমদ মুসার ক্ষেত্রে এর লেশমাত্র নেই। তার কন্ঠ নরম কিন্তু অত্যন্ত পৌরুষদীপ্ত। তার কথার মধ্যে কোথাও সামান্য দুর্বলতা কিংবা দ্বিধার লেশমাত্র থাকে না'। বলল জিনার আব্বা।

'তার বড় একটা গুণ সে অত্যন্ত স্বাবলম্বী। অসুস্থ অবস্থাতেই নিজের কাজ সে নিজ হাতে করতে চেয়েছে। সেদিন আমি ওষুধ খাওয়ার সময় তার গ্লাসে পানি ঢালতে গিয়েছিলাম। সে বলে উঠল, 'সন্তান থাকতে মাকে যদি এসব কাজ করতে হয়, তাহলে সন্তানের অপরাধ হয় মা'। এমন সচেতনতা, এমন দৃষ্টিভংগি, মাকে এমন মর্যাদা দিতে আমি কাউকে দেখিনি'।

'উনি সত্যিই অদ্ভুত মা। সেদিন উনি টয়লেটে ছিলেন, বিছানা-টেবিল দেখলাম আগোছালো। মনে করলাম, আমি গুছিয়ে দেই। গোছানো প্রায় শেষ করেছিলাম। উনি বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে উনি একটু হাসলেন বটে। কিন্তু চারদিকে চেয়ে তার চোখ ও চেহারায় যে ভাব ফুটে উঠল তাতে বুঝলাম, তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্রভাবে বলেই ফেললেন, বড় ভাইয়ের যা করা উচিত, তা ছোট বোনের করে দেয়া ঠিক নয়'।

আমি বলেছিলাম, 'ঠিক নয়, কিন্তু করে দেয়া তো অন্যায় নয়'।

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘অন্যায় সম্পর্কে ধারণা সব সময় মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল। আমি যাকে অন্যায় বলব, তাকে তুমি অন্যায় মনে নাও করতে পার’।

‘এ কথাটুকুর মধ্যে তিনি বিরাট কথা বলেছিলেন। হজম করতে আমার সময় লেগেছিল। একটু পরে আমি বলেছিলাম, ‘বুঝেছি, আমাদের আলাদা মুল্যবোধের কথা বলছেন, আমি এ বিষয়টা ভাল বুঝি না’। বলে আমি চলে এসেছিলাম। আমার কিছুটা রাগ হয়েছিল, অপমানও বোধ করেছিলাম কিছুটা। সেদিনই যখন তাঁর সাথে আমার আবার দেখা হলো, তিনি বলেছিলেন, জিনা বোন, তুমি রাগ করেছ আমি বুঝতে পেরেছি। মনে রেখ, এই পৃথিবীতে যে জীবন ও জগৎ তুমি দেখছ, সেখানে সবাইকেই কিছু গ্রহণ এবং কিছু বর্জন করে চলতে হয়। এই গ্রহণ বর্জনের জন্যে তোমার ভ্যালু জাজমেন্ট (মাপকাঠি) থাকতে হবে। একে তুমি নীতিবোধ বা দৃষ্টিভংগিও বলতে পার। এটা না থাকলে গ্রহণ-বর্জনের গুরুত্বপূর্ন কাজে ভুল হতে পারে?’

আমি বলেছিলাম, বুঝেছি। আপনি বিরাট দার্শনিক কথা বলেছেন। কিন্তু এর দ্বারা আমাকে কি বুঝাতে চাইছেন’।

‘তোমার চোখে আমি অসন্তুষ্টি দেখেছিলাম, তাই একথাগুলো আমার বলা। আমি তোমাদের অল্প সময়ের অতিথি। আমার আচরণ যদি তোমাদের কষ্ট দেয়, তাহলে সেটা আমার জন্যে বড় কষ্ট হয়ে থাকবে’।

‘তাঁর কণ্ঠস্বর ভারি ছিল। আমার খুব খারাপ লেগেছিল। বুঝলাম, আমার কথায় তিনি আহত হয়েছেন। আমি বললাম, আমি আমার কথার জন্যে মাফ চাচ্ছি। কিন্তু আমি জানতে চাই, আমার কাজটুকুকে আপনি অন্যায় মনে করেছিলেন কেন?’

কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে থাকলেন পরে বললেন, ‘অনেক কথা আছে বোন যা স্পষ্ট করে বলা যায় না। আসল ব্যাপার হলো, আমি যথা সম্ভব চাই না আমি একা থাকা অবস্থায় আমার বদ্ধ ঘরে একা এমন কোন মেয়ে প্রবেশ করুন যিনি আমার মা নন, সহোদর বোন, খালা নন, ফুফি নন। এটা আমার দুর্বলতা নয়, দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে এটা আমার সতর্কতা’।

তিনি থামলেও আমি অনেকক্ষণ কথা বলতে পারিনি। আমি স্তম্ভিতভাবে তাকিয়েছিলাম তাঁর দিকে। তাঁর কথা আমি পুরোপুরিই বুঝতে পেরেছিলাম। হঠাৎ করেই আমার যেন মনে হয়েছিল, যাকে আমি দেখছি, তিনি আমার দেখা মানুষের মত কোন মানুষ নন।

কোন ভাবে আমি বলতে পেরেছিলাম, ধন্যবাদ ভাইয়া। আপনাকে ভাই বলে ডাকতে পারায় আমার গর্ববোধ হচ্ছে।

মাথা ঝুকিয়ে তাকে একটা বাও করে চলে এসেছিলাম।

সবাই অবাক বিস্ময়ে শুনছিল জিনার কথা।

'আসলে এই ছেলেটা কে? চরিত্র, সাহস, শক্তি সবদিক দিয়েই বিস্ময়কর। কে এই ছেলেটি?' বলল জিনার মা।

'সুস্থ হয়ে উঠেছে, এখন জিজ্ঞাসা করা যায়'। বলল জিনার আব্বা।

'আব্বা, তাকে আমি অদ্ভুত এক ধরণের ব্যায়াম করতে দেখেছি। জিনা আপাও দেখেছে'। বলল মার্ক মরিস।

'অদ্ভুত কেমন?' বলল জিনার মা।

'মার্ক ঠিকই বলেছে মা। আমিও দেখেছি'। বলল জিনা।

'বলত শুনি'। বলল জিনার আব্বা।

মার্ক তার দেখা সব কাহিনী খুটিয়ে খুটিয়ে বলল। সব শুনে ভ্রু কুচকালো জিনার আব্বা ফ্রাংক মরিচ। বলল, 'মার্ক তুমি নিজে করে দেখাও দেখি ব্যাপারটা'।

মার্ক নিখুতভাবে তা দেখাল।

মার্ক-এর ডেমোনেস্ট্রেশন শেষ হবার আগেই জিনার আব্বা বলে উঠল, আর দরকার নেই মার্ক। এটা মুসলমানদের প্রার্থনা'। প্যারিসের মসজিদে একদিন এ প্রার্থনা আমি দেখেছি'।

'এটা মুসলমানদের প্রার্থনা? তাহলে...'। প্রায় এক সংগেই বলে উঠল জিনার মা, জিনা এবং মার্ক।

'তাহলে মুসায়েভ মুসলমান'- এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই'। বলল জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক।

‘এবং তাহলে প্রার্থনায় দুর্বোধ্য ভাষায় তাকে যেটা পড়তে শুনেছি, সেটা ওদেঁর ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি, তাই না আব্বা?’ সোৎসাহে বলে উঠল জিনা।

জিনা উঠল। বলল, ‘আমি যাই, এ সুখবর ফ্রান্সিসকে দিতে হবে’।

‘ফ্রান্সিসকে দিতে পার। কিন্তু যেহেতু সে ব্যাপারটা গোপন রেখেছে, তাই এটা প্রচার না হওয়াই ভাল’। বলল মিঃ ফ্রাংক।

‘ঠিক আছে’। বলে দৌড় দিল জিনা।

ফ্রান্সিসের বাড়িতে ঢুকেই পেল ফ্রান্সিসের মাকে। বলল, ‘চাচী আম্মা, ফ্রান্সিস কোথায়?’

‘কেন বাইরে নেই?’

‘নেই’।

‘তাহলে কোথাও গেছে’।

‘ও কি বাইরে কোথাও গিয়েছিল। ক’দিন দেখছি না যে’।

‘না কোথাও যায়নি। তোমার উপর মনে হয় খুব রেগে আছে। কাল তোমাকে ডাকতে যেতে বলেছিলাম আমার কম্পিউটারটা তোমাকে একটু দেখাব বলে। বলল, কারো বাড়িতে আমি যেতে পারব না। আমি ঠিক করে দেব’।

‘কেন রাগ করেছে চাচী আম্মা?’

‘সেদিন জন্মদিনে তুমি আসনি’।

‘ও এই’।

বলে জিনা বেরিয়ে গেল ফ্রান্সিসের খোজে।

পেল তাকে বাড়ির নিচেই ওদের বাগানে।

যেতে যেতে জিনা ভাবছিল, সত্যি কয়দিন থেকে জিনারও আসা হয়নি এদিকে। জন্মদিনে আসতে পারেনি আহত ও সংজ্ঞাহীন মেহমান নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে। ঐ দিনই পিকনিক থেকে তাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

ফ্রান্সিস বসে আছে তাদের সবজি ও ফুলের বাগানে। বাগানটিতে ফুল গাছের ফাকে ফাকে প্রচুর সবজিও ফলানো হয়েছে।

বসে বসে একটা সবজি গাছের পরিচর্যা করছিল ফ্রান্সিস।

জিনা ফ্রান্সিসের একদম পিঠের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। খেয়াল করল না ফ্রান্সিস।

জিনা তর্জনি দিয়ে টোকা দিল ফ্রান্সিসের মাথায়।

ফ্রান্সিস চমকে ফিরে তাকাল। ঠোঁটে তার এক ঝলক হাসি ফুটে উঠেও মিলিয়ে গেল। মুখ গম্ভীর করে বলল, 'এদিকে কি মনে করে?'

'চাচী আম্মা ঠিকই বলেছেন। খুব তো রাগ দেখছি!' ঠোঁটে দুষ্টুমী হাসি টেনে বলল জিনা।

'রাগ কিসের? আমি জিজ্ঞাসা করছি, এদিকে কেন রাজপুত্তুরকে ছেড়ে?' ক্ষোভে মুখ লাল করে ফেলল ফ্রান্সিস।

জিনার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। মুখে ফুটে উঠল তার অপমানের চিহ্ন। তীব্র কন্ঠে বলল, 'ফ্রান্সিস তুমি কি বলছ জান?'

'জানি, রাজপুত্তুরের কথা। ময়ুরপংখীতে চড়ে আসা রাজপুত্তুরের কথা'।

'চুপ কর ফ্রান্সিস, ওর সম্পর্কে একটা কথাও বলবে না'। কঠোর কন্ঠ জিনার। রাগে, ক্ষোভে তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কাঁপছে তার ঠোঁট।

ফ্রান্সিসের চোখ-মুখ আরও কঠোর হয়ে উঠল। বলল অনেকটা ব্যাংগ করেই, 'জানতাম তোমার খুব লাগবে'।

'তুমি পাগল হয়ে গেছ। কমনসেন্স হারিয়ে ফেলেছ ফ্রান্সিস'। তীব্র ক্ষোভে চিৎকার করে উঠল জিনার কন্ঠ।

'এখানে চিৎকারের কোন প্রয়োজন নেই। তুমি যাও। আমি রাজপুত্তুর নই, ছোট্ট জাতির সামান্য মানুষ আমি'। বলে আবার বসে পড়ল ফ্রান্সিস।

'ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। আমাকে তুমি এত ছোট করবে, তুমি এত ছোট হবে আমি ভাবিনি'। কান্নায় ভেঙে পড়ল জিনা। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে ঘুরে দাড়িয়ে পাগলের মত দৌড় দিল সে।

কয়েক গজ গিয়েই বাগানের লাইট পোস্টের সাথে ধাক্কা খেল জিনা। একটা ছোট্ট আর্তনাদ তুলে পড়ে গেল সে।

দেখতে পেল ফ্রান্সিস। একটু দ্বিধা করল। তারপর ছুটে গেল জিনার কাছে। টেনে তুলল জিনাকে মাটি থেকে। এক হাতে জড়িয়ে রেখে মাথা পরীক্ষা

করে বলল, ‘কেটে গেছে’। পকেট থেকে রুমাল বের করে আহত স্থানটা চেপে ধরল এবং বলল, ‘চল বাসায়’।

জিনা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, ‘ছেড়ে দাও আমাকে। আর মায়া দেখাতে হবে না। যেতে দাও আমাকে তোমার রাজপুত্তুরের কাছে’।

‘মায়া দেখাচ্ছি না। যাবে। তার আগে বাসায় চল’। বলে ফ্রান্সিস জিনাকে টেনে নিয়ে চলল বাসার দিকে।

বাসায় ঢুকতেই ফ্রান্সিসের আম্মা বলল, ‘কি হয়েছে জিনার?’

‘ইলেকট্রিক পোলের সাথে ধাক্কা লাগিয়ে মাথা কেটে ফেলেছে আম্মা’। বলল ফ্রান্সিস।

‘কিভাবে ধাক্কা খেল? খুব কেটে গেছে?’

‘ও রাগলে কিছু চোখে দেখে না আম্মা’।

‘আবার আমাকেই দোষ দিচ্ছ?’ তার কন্ঠে কান্নার সুর।

‘ফ্রান্সিস তুই এখান থেকে যা। তোর কান্ডজ্ঞান কোনদিন হবে না’। বলে ফ্রান্সিসের মা জিনাকে কাছে টেনে নিল। বলল, ‘দেখি মা কেমন কেটেছে’।

ফাস্ট এইড বক্স নিয়ে ফিরে এল ফ্রান্সিস।

আঘাতটা বড় কোন কাটার পর্যায়ে যায়নি। চামড়া একটু ছিড়ে গিয়ে একটু রক্ত বেরিয়েছে। তবে জায়গাটা ফুলে উঠেছে বেশ। কিচুক্ষণ বরফ দেয়ার পর তুলা দিয়ে ওষুধ লাগিয়ে দিল ফ্রান্সিস।

‘এ কিছু নয়, দু’এক দিনেই সেরে যাবে। মাথায় চিরুনিটা একটু সাবধানে কোরো’। বলল ফ্রান্সিসের আম্মা।

‘আসি চাচী আম্মা’। বলে জিনা চলতে শুরু করল।

ফ্রান্সিস হাত পরিষ্কার করে রুমাল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বাড়ির গেটে জিনার সামনে দাঁড়াল।

জিনা মুখ তুলে চাইল ফ্রান্সিসের দিকে। মুহুর্তকাল চেয়ে থেকে বলল, ‘আর কি অপমান করার তোমার বাকি আছে?’ থাকলে করো’।

ফ্রান্সিসের চোখে এখন আর রাগ নেই। চোখে-মুখে কিছুটা অনুশোচনার ভাব। বলল, ‘সব দোষ আমার, তোমার কোন দোষ নেই?’

‘দোষ তো আছেই। তাই তো যা তা বলেছ, আরও বল’। বলে জিনা ফ্রান্সিসকে পাশ কাটিয়ে চলতে শুরু করল।

গেট থেকে বেরিয়ে এসে জিনা ফিরে তাকাল। ফ্রান্সিস দাড়িয়ে ছিল গেটে মুখ ভার করে।

ফ্রান্সিসের দিকে না তাকিয়ে মুখ নিচু করে বলল, ‘আমি তোমাকে এমন একটা সুখবর দিতে এসেছিলাম, যা এই গ্রামে, এই দেশে তোমাকেই খুশী করত সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তুমি বলতে দিলে না। চাপালে আমার মাথায় অপবাদের বোঝা’। বলে জিনা ঘুরে দাড়িয়ে চলতে শুরু করল।

ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে জিনার সামনে দাঁড়াল। বলল, ‘ঠিক আছে তুমি যাও কিন্তু একটা কথা বল, আমি যা তোমাকে বলেছি, তা আমি কি বিশ্বাস করি?’ ভারি কন্ঠ ফ্রান্সিসের।

‘আমি যা উত্তর দেব, তা তুমি জান। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি এমন কথা তুমি বলতে পার কেমন করে?’

‘এমন অবস্থায় পড়লে তোমার রাগ হতো না?’

‘হয়তো হতো। কিন্তু এমন জঘন্য কথা তোমাকে বলতে পারতাম না’। আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল জিনার কন্ঠ।

অশ্রু নেমে এল ফ্রান্সিসের চোখে।

জিনার পথ থেকে সরে দাড়িয়ে ফ্রান্সিস বলল, ‘ঠিক আছে যাও জিনা’।

জিনা নড়ল না। বলল, ‘কথাটা শুনবে না?’ ফ্রান্সিসের দিকে না তাকিয়েই বলল জিনা।

উত্তর দিল না ফ্রান্সিস। দাড়িয়ে রইল চুপ করে।

জিনা পকেট থেকে রুমাল বের করে ফ্রান্সিসের দিকে তুলে ধরে বলল, ‘চোখ মুছে এস আমার সাথে’।

‘কোথায়?’

‘তোমার রাজপুত্তুরের কাছে’।

‘আমাকে শাস্তি দেবার আর কোন পথ কি তোমার নেই জিনা?’

জিনার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'আবার ঝগড়া বাধাবে? আমাকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে পার না?'

'ঠিক আছে, চল জিনা'। চোখ মুছে নিয়ে বলল ফ্রান্সিস।

দু'জনেই হাঁটতে শুরু করল জিনার বাড়ির দিকে।

'রাগ করে হোক, যেভাবেই হোক তুমি একটা সাংঘাতিক সত্য কথা বলেছে ফ্রান্সিস'। বলল জিনা।

'কি বলেছি?'

'আমাদের মেহমান সত্যিই রাজপুত্তুর। এমন বিস্ময়কর মানুষ চোখে দেখতে পাব তা কোনদিন ভাবিনি'।

'যতই বল রাগ আর আমার আসবে না'।

'তোমার রাগের কথা নয়। কথাটা আমি সত্যিই বলছি। চল গেলেই বুঝতে পারবে। জান সে কে?'

'কে?'

'মুসলমান'।

'মুসলমান? মুসলমান?' বলতে বলতে দাড়িয়ে পড়ল ফ্রান্সিস।

'এস, দাঁড়াবার দরকার নেই' বলে টেনে নিয়ে যেতে যেতে জিনা বলল, 'উনি পরিচয় দেননি। ব্যাপারটা আমরা গোপনে দেখেছি। গোপনে আমরা তাকে প্রার্থনা করতে দেখেছি, তোমাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি পাঠ করতেও শুনেছি'।

আনন্দ ও বিস্ময়ে মনটা ভরে গেল ফ্রান্সিসের। বলল, 'কিন্তু পরিচয়টা গোপন করেছে কেন?'

'বললাম না লোকটা বিস্ময়কর। আমরা নিজ চোখে দেখলাম, আক্রান্ত হওয়ার পর দশজন লোককে পরাজিত ও হত্যা করে বিজয় লাভ করল। কিন্তু এ শক্তির চেয়ে বিস্ময়কর হলো তার চরিত্র। একটা কেন একশ'টা জিনা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে না, তা জানো গর্দভ'।

'তুমি সত্যিই আমার সাথে রসিকতা করছ জিনা'।

'ঠিক আছে চল'।

আহমদ মুসার ঘরে তাকে পেল না জিনা। বলল, ‘চল ফ্রান্সিস, নিশ্চয় ভেতরের ড্রইং রুমে আছেন তিনি’।

ড্রইং রুমে প্রবেশ করল জিনা ও ফ্রান্সিস। দেখল জিনা, তার আব্বা, আম্মা, মার্ক ও আহমদ মুসা বসে গল্প করছে।

জিনা ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে আহমদ মুসাকে বলল, ‘মুসায়েভ ভাইয়া এ ফ্রান্সিস, আমার বন্ধু’।

আহমদ মুসা হাত বাড়াল ফ্রান্সিসের দিকে। হ্যান্ডশেক করল দু’জনে।

ফ্রান্সিস প্রথম দৃষ্টিতেই আহমদ মুসা সম্পর্কে যে উপলব্ধি করল তা হলো, লোকটা একদম স্বচ্ছ। তার মুখের দিকে তাকাতেই তার হৃদয়টাকে দেখা যায়। ফ্রান্সিসের দ্বিতীয় অনুভূতিটা হলো, লোকটা যেন তার শত বছরের চেনা। কোন অপরিচয়ের ব্যবধান তাদের মধ্যে যেন নেই। মুহুর্তেই আপন হয়ে গেছে। আহমদ মুসার সাথে যখন হ্যান্ডশেক করল তার মনে হলো, আত্মশক্তির একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ যেন খেলে গেল তার গোটা সত্ত্বায়।

জিনা গিয়ে বলল তার আব্বার পাশে। আর ফ্রান্সিস বসল মার্ক-এর সোফায়।

‘যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম বৎস’, বলে শুরু করলো জিনার আব্বা, ‘সেদিন সুর লোরে’তে তোমাকে যেভাবে আমরা মোকাবিলা করতে দেখলাম, তারপর গত কয়েকদিন তোমাকে যা দেখলাম, তাতে, সত্যি বলছি, তোমাকে সাধারণ কেউ বলে আমাদের মনে হয়নি, এজন্যে আমাদের বিরাট কৌতুহল তোমাকে জানার’।

একটু থামল জিনার আব্বা। থেমেই আবার শুরু করল, ‘আমরা বুঝতে পারছি, তুমি এশিয়ান। তোমার দেশ কোথায়?’

আহমদ মুসা মুখ নিচু করল। তারপর বলল, ‘একজন অপরিচিত সম্পর্কে এই কৌতুহল স্বাভাবিক জনাব। কিন্তু বুঝতে পারছি না আপনার প্রশ্নের উত্তরে কি বলব আমি। চীনের তুর্কিস্থান (সিংকিয়াং) প্রদেশে আমি জন্মগ্রহণ করি। কিন্তু আজ আমার কোন দেশ নেই’। শান্ত ও নরম কন্ঠ আহমদ মুসার।

‘কেন, তোমার বাড়ি নেই?’

'না, আমার কোন বাড়ি নেই'।

'কেন বাপ, মা, ভাই, বোন...'।

'না, আমার কেউ নেই জনাব'। একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল আহমদ মুসার ঠোটে। তাতে বেদনাই ঝরে পড়ল বেশী। চোখ নিচের দিকে রেখে কথা বলছিল আহমদ মুসা।

কারও মুখে কোন কথা নেই। আহমদ মুসার উত্তরগুলো সবাইকে স্তম্ভিত করেছিল। তাদেরকে কিছুটা বেদনার্তও করেছে। সবার দৃষ্টি আহমদ মুসার ম্লান মুখের দিকে।

'এমনটা কি করে হয় বৎস?' বলল জিনার আম্মা।

'হয় আম্মা। সিংকিয়াং থেকে হাজার হাজার মুসলিম পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। আমার পরিবার তার একটি। বিতাড়িত হবার সময় সব হারিয়েছি। কেউ মারা গেছেন, কেউ নিহত হয়েছেন'।

'তাই বলে তোমার দেশ থাকবে না, বাড়ি থাকবে না?'

'সব দেশই আমার দেশ। আর বাড়ির প্রয়োজন হয়নি আমার'।

'কিন্তু তোমার পাসপোর্ট?'

'ওটা কোন সমস্যা হয় না। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে যখন যে দেশের পাসপোর্ট চাই দিয়ে দেয়'।

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক মরিচ। এ কথা সবাইকেই বিস্মিত করর। ফ্রান্সিস শুধু বিস্মিত নয়, তার হৃদয়টা একটা অপরিচিত বেদনায় ভরে গিয়েছিল। সে ভাবতে পারছিল না, এমন মূলহীন অসহায় মানুষ দুনিয়াতে থাকে! আর জিনা ভাবছিল, কি অদ্ভূত! রাজপুত্তুরের ভেতরে এক চরম 'নিঃস্বতার বেদনা!'

'সেদিন সুর লোরে'তে কাদের সাথে তোমার সংঘর্ষ হলো?' বলল জিনার আব্বা।

আহমদ মুসা মুখ তুলে একবার চারদিকে চাইল। মিঃ ফ্রাংক মরিচ আহমদ মুসার দ্বিধা বুঝতে পারল। বলল, 'এখানে সবাই আমরা তোমার মংগলকামী'।

‘ধন্যবাদ’, জানিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘ওরা ‘ব্ল্যাক ক্রস’-এর লোক’।

‘ব্ল্যাক ক্রস’-এর লোক?’ জিনার আব্বার কন্ঠে ভয় ও বিস্ময় দুটোই ফুটে উঠল।

‘ব্ল্যাক ক্রস’ কি আব্বা? তুমি চেন?’ পাশ থেকে বলে উঠল জিনা।

‘চিনি না। সম্প্রতি ওদের সম্পর্কে জেনেছি। ওটা একটা গোপন খৃষ্টান সংগঠন। বিশ্বজোড়া ওদের কাজ। ক্রুসেড চালাচ্ছে ওরা অন্য ধর্ম বিশেষ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। ওদের সুনামও আছে, আবার সবাই জানে ওটা খুনে সংগঠন, পশুর চেয়েও নাকি নৃশংস। ওদের শত্রুর খাতায় নাম উঠলে তার আর রক্ষা নেই’।

‘আপনি ঠিক বলেছেন জনাব’। বলল আহমদ মুসা।

সকলের চোখেই ভয় এবং আতংক।

ড্রইং রুমের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এস। কোন কথা বাইরে না যাওয়াই ভাল।

‘ওদের সাথে তোমার এই সংঘাতের কারণ কি? তুমি শত্রু হলে কেমন করে ওদের?’ বলল জিনার আব্বাই।

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘আমার সাথে তাদের কোন শত্রুতা নেই। ক্যামেরুনের একজন যুবককে তারা প্যারিস থেকে কিডন্যাপ করেছে। সে আমার বন্ধু, তাকে আমি উদ্ধারের চেষ্টা করছি’। এরপর আহমদ মুসা একটু থেমে ওমর বায়াকে কেন্দ্র করে যা ঘটেছে সব কথা খুলে বলল।

সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনল ওমর বায়ার সেই কাহিনী। সবার চোখে-মুখে ফুটে উঠল অসহনীয় এক বেদনার ছাপ। আর জিনা এবং ফ্রান্সিসের চোখ সিক্ত হয়ে উঠেছিল অশ্রুতে। আহমদ মুসা তাদের সকলের কাছে আরও মহত্তর রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলো। নিজ জাতির জন্যে এমন ভালবাসা, একজন ব্যক্তি জন্যে এইভাবে বিপদে ঝাপিয়ে পড়ার কথা তারা বইতেই পড়েছিল কিন্তু তাকে আজ তারা চোখের সামনে মূর্তিমান দেখতে পাচ্ছে।

‘ওমর বায়ার কোন সন্ধান পেয়েছ?’ বলল জিনার আব্বা।

'আমি মাত্র কয়েকদিন আগে প্যারিস এসেছি। প্যারিসে ওদের একটা ঘাটির খোঁজ পাই। যে রাতে আমি আসি, তার পরের রাতেই ওদের ঘাটিতে যাই আমি ওমর বায়ার....'।

আহমদ মুসাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই জিনার আব্বা জিজ্ঞাসা করল, 'একা গেলে?'

'জি, হ্যাঁ'।

আহমদ মুসা এরপর ব্ল্যাক ক্রস-এর সাথে তার যা ঘটেছে সব কথা বলল। 'সুর লোরে'-এর ঘটনা পর্যন্ত।

আহমদ মুসা কথা শেষ করলেও কেউ কথা বলল না। বলতে পারল না। সবার মুখ ভয়ে, বিস্ময়ে হা হয়ে গেছে। যা তারা শুনল ফিল্মের কাহিনীর চেয়ে চমৎকার, ফিল্মের কাহিনীর চেয়েও যেন ভয়ংকর।

জিনা ও মার্ক-এর মনে হলো তাদের সামনের লোকটি একজন জীবন্ত রবিনহুড কিংবা তার চাইতেও বড়। আর ফ্রান্সিসের বুকটা অসীম এক আবেগে ভরে গেছে। আহমদ মুসাকে তার মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে শত্রু নিধনের জন্যে স্বর্গ থেকে পাঠানো গ্রীক দেবতাদের একজন তিনি।

'ব্ল্যাক ক্রস-এর ২৪জন এ পর্যন্ত তোমার হাতে নিহত হয়েছে?' বিস্ময়-রুদ্ধ কন্ঠে বলল জিনার আব্বা।

'আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া কাউকে আমি মারি না। মারতে চাইলে জাহাজে আরও সাত আটজন লোক মরত'।

সবাই চুপ চাপ।

নীরবতা ভাঙল জিনার আম্মা। বলল, 'আমরা যা ভেবেছি তাই, তুমি সাধারণের মধ্যে পড় না। কিন্তু তুমি কে? তুমি যে মুসলমান, তোমার প্রার্থনা করা থেকে আমরা বুঝেছি এবং আজ তুমিও বললে। তোমার আর পরিচয় কি?'

আহমদ মুসা মাথা নিচু করল। তৎক্ষণাৎ কোন কথা বলল না। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে বলল, 'আপনারা আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাচিয়েছেন এবং আপনাদের কাছে যে স্নেহ পেয়েছি তাও কোনদিন ভুলবার নয়। আপনাদের কাছে কোন কিছু গোপন করা ঠিক নয়'। বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর

আবার শুরু করল, 'আমি আপনাদের কাছে আমার মিথ্যা নাম বলেছি। আমার নাম আহমদ মুসা।

জিনার আব্বার ভ্রু কুঞ্চিত হলো। বলল, আমি এক আহমদ মুসা সম্পর্কে পড়েছি। তিনি অতি বড় বিপ্লবী। ফিলিস্তিন, মিন্দানাও, মধ্য এশিয়া বিপ্লবের নায়ক তিনি। ককেশাস, বলকান এবং মাত্র কিছুদিন আগে স্পেনেও তিনি মুসলমানদের পক্ষে বিরাট পরিবর্তন এনেছেন। তাকে তুমি মানে তুমি..'।

কথা শেষ না করেই থেমে গেল জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক মরিচ। যা তিনি বলতে চান তা যেন বলতে পারছেন না। তার চোখে মুখে বিস্ময় মিশ্রিত বিব্রত ভাব।

আহমদ মুসা তার নত মুখটা ঈষৎ উপরে তুলে শান্ত কন্ঠে বলল, 'জি, আমি সেই আহমদ মুসা'।

কথাটা কানে যাওয়ার সাথে সাথেই জিনার আব্বা অজ্ঞাতেই যেন উঠে দাড়াল। আবার বসল। বিস্ফোরিত তার দু'টি চোখ। একটা অপ্রস্তুত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব তার মধ্যে। জিনা, ফ্রান্সিস, মার্ক স্বপ্ন দেখছে যেন। হঠাৎ করেই পরিচিত পৃথিবীটা উল্টে গিয়ে যেন তারা এক রূপকথার দেশে হাজির হলো এবং দিগ্বিজয়ী এক রূপকথার রাজপুত্তুর তাদের সামনে। চোখ ভরে দেখছে তারা সেই রাজপুত্তুরকে।

জিনার মা বিস্মিত হয়েছে, কিন্তু তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে। বলল, 'তাই বলি, অতবড় মানুষ না হলে মানুষ এমন হয় না। এসব কাজ অন্য কার সাধ্য!'

'আমি কোন দিক দিয়েই কোন বড় মানুষ নই আম্মা। আমি আমার জাতির সেবক, মজলুম মানুষের সেবক'। শান্ত ও নরম কন্ঠে বলল আহমদ মুসা।

জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক নিজেকে সামলে নিয়েছিল। বলল, 'মিঃ আহমদ মুসা 'তুমি' বলে আপনাকে যে অসম্মান করেছি তার জন্যে আমি লজ্জিত। আপনি যে কত বড় তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না'।

আহমদ মুসা সংগে সংগেই উঠে দাঁড়াল। অভিমান ক্ষুব্ধ কন্ঠে বলল, 'আপনি যদি এভাবে কথা বলেন, 'আপনি' বলে সম্বোধন করেন, তাহলে এখানে

আমি এক মুহুর্তও থাকতে পারবো না। এ ধরনের সম্মান আমার কাছে বন্দুকের গুলীর চেয়েও কষ্টকর'। আহমদ মুসার কন্ঠ ভারি হয়ে উঠেছিল।

জিনার আব্বাও উঠে দাড়িয়েছিল। অবাক বিস্ময়ে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল আহমদ মুসার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আহমদ মুসার দুই কাধে হাত দিয়ে বসিয়ে দিল। বলল, 'তুমি আরও বড় হবে। এমন মানুষরাই বড় হয়'।

সোফায় ফিরে এল জিনার আব্বা।

আহমদ মুসা জিনা, মার্কদের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমাদের চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, আমি তোমাদের পর হয়ে গেলাম হঠাৎ করে। দেখ, রক্তের সম্পর্কের আপন কেউ নেই তো আমার, তাই পর হওয়ার বেদনাটা আমি বেশী বুঝতে পারি'।

জিনা ও মার্ক দু'জনেরই চোখে-মুখে নেমে এল লজ্জা। জিনা মুখ ঢাকল।

'তা নয় বাছা, বিস্ময়ের ধাক্কা ওরা সামলাতে পারেনি'। বলল জিনার মা।

'ঠিক বলেছ আম্মা'। বলে জিনা আহমদ মুসার দিকে চেয়ে ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল, ভাইয়া, এই ফ্রান্সিসের আরেকটা পরিচয় আছে, সে মুসলমান। নাম ফ্রান্সিস আবুবকর।

'মুসলমান?'

'হ্যাঁ ভাইয়া'।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়ালো। এগুলো ফ্রান্সিসের দিকে। ফ্রান্সিসও উঠে দাড়িয়েছিল। আহমদ মুসা জড়িয়ে ধরল ফ্রান্সিসকে। অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে থাকল। তারপর চুমু খেল তার কপালে একটা। বলল, 'এমন এক স্থানে কোন ভাইকে দেখব ভাবিনি'।

ছেড়ে দিল ফ্রান্সিসকে। আনন্দ, বিস্ময় ও আবেগে চোখ অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠেছে ফ্রান্সিসের।

আহমদ মুসা ফ্রান্সিসকে ছেড়ে গিয়ে পাশেই বসে থাকা মার্ক মরিসের কপালে চুমু খেয়ে বলল, 'মনে করো না ফ্রান্সিসের চেয়ে তোমাকে কম ভালবাসি'।

‘ধন্যবাদ ভাইয়া’। মার্ক বলল হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে।

ফ্রান্সিসের এই গৌরবে সবচেয়ে খুশী হয়েছিল জিনা। আনন্দের অপরিসীম ঔজ্জ্বল্য ঠিকরে পড়ছিল জিনার চোখ মুখ থেকে।

আহমদ মুসা তার আসনে ফিরে এলে জিনা বলল, ‘ভাইয়া, ফ্রান্সিস শুধু নামেই মুসলমান। ও ধর্মগ্রন্থই দেখেনি, প্রার্থনা করতেও জানে না এবং মুসলমান ধর্মের কিছুই পালন করে না’।

‘এটা ওর দোষ নয় জিনা, এ দোষ মুসলিম জাতির। জাতি ফ্রান্সিসদের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করেনি’। বলল আহমদ মুসা।

‘ভাইয়া, আপনি ফ্রান্সিসকে সাংঘাতিক উপরে তুললেন। ও এখন জাতির ঘাড়ে দোষ দিয়ে বগল বাজাবে’। জিনা বলল ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে।

‘সে সুযোগ হবে না। আমি ওকে সব শিখিয়ে দেব। তারপর সে সব পালন করবে’।

‘আমাকেও শিখিয়ে দিতে হবে ভাইয়া। তা না হলে ও বাহাদুরি দেখাবে’।

‘ঠিক আছে’।

‘বাঁকা কথা বলে ঝগড়া বাধানো ওর একটা অভ্যাস ভাইয়া’। বলল ফ্রান্সিস।

‘আবার ফ্রান্সিস, সব কথা কিন্তু ভাইয়াকে বলে দেব’।

এই কথার সংগে সংগে ফ্রান্সিসের মুখটা চুপসে গেল। করুণ চোখে তাকাল জিনার দিকে। কিছুক্ষণ আগে আহমদ মুসাকে নিয়ে জিনার সাথে যা ঘটেছে তা তার মনে পড়ে গেছে। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল তার মুখ।

‘থামাও তোমাদের ঝগড়া’। বলে জিনার আম্মা আহমদ মুসার দিকে চেয়ে বলল, ‘কিছু মনে করো না বাছা, ‘ঝগড়াই এ দু’জনের সংস্কৃতি। আগে মারামারি করত, এখন তার বদলে করে ঝগড়া’।

আহমদ মুসা হাসল। আহমদ মুসা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই কথা বলে উঠল জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক। বলল, ‘এখন তোমার কি পরিকল্পনা আহমদ মুসা’।

আহমদ মুসার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, 'সুস্থ হয়ে উঠেছি। এবার ওমর বায়ার সন্ধদনে বেরুব'।

'আবার? একা?' আৎকে উঠল জিনার কন্ঠ।

'একাই বেরুতে হবে। ওমর বায়া কোথায় জানি না। জানলে অন্যের সাহায্য নেয়া যেতো'।

'কিন্তু ব্ল্যাক ক্রস বিরাট দল, বিপুল জনশক্তি। আবার তো বিপদে পড়বে তুমি'। বলল জিনার আব্বা।

'হয়তো পড়বো। কিন্তু অন্য পথ তো নেই ওমর বায়াকে উদ্ধারের'।

'পুলিশকে বললে?'

'ফরাসি পুলিশ ব্ল্যাক ক্রস-এর কেশও স্পর্শ করবে না। পুলিশের কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না'।

'ব্ল্যাক ক্রস ভীষণ ক্ষেপে আছে তোমার উপর। এই অবস্থায় ওদিকে অগ্রসর হওয়া মানে মৃত্যুর কোলে ঝাপিয়ে পড়া'। বলল জিনার আব্বা।

'ঝুকি তো নিতেই হবে, আর মৃত্যু আল্লাহর হাতে। আল্লাহর নির্দিষ্ট করা সময়েই তা আসবে। সুতরাং এ নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই'। নিশ্চিন্ত কন্ঠে শান্ত ভাষায় জবাব দিল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামল।

কেউ কোন কথা বলল না।

সবার দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর নিবদ্ধ।

দৃষ্টিতে তাদের বিস্ময়। সম্পর্কহীন একজন মানুষের জন্যে একজন মানুষ এইভাবে জীবন বিলিয়ে দিতে এগিয়ে যেতে পারে।

ভাবছিল জিনার আব্বা। বলল, 'ক'দিন আগে একটা গল্প শুনেছিলাম। সেটাও কিডন্যাপের কাহিনী। তোমার কাহিনী শুনে সে কথাটা আমার মনে পড়ছে। বিস্ময়করভাবে আমার শোনা সে কাহিনীর বন্দীও মুসলিম'।

'কি সেই কাহিনী জনাব'। আগ্রহের সাথে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'কাহিনীটা বেশী বড় নয়। সেই মুসলিম বন্দীকে কিডন্যাপ করে তার কাছ থেকে কথা আদায় ও তাকে বশে আনার জন্যে তার উপর অকথ্য নির্যাতন

চালায়। দয়া পরবশ হয়ে একজন গোপনে তার খবর তার লোকদের কাছে পৌছাবার একটা সুযোগ করে দেয়। কিন্তু ধরা পড়ে যায় কৌশলটি। ধরা পড়ার পর কে তাকে সাহায্য করেছে এটা জানার জন্যে তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও সে তার সাহায্যকারীর নাম প্রকাশ করেনি। সাহায্যকারীর প্রতি লোকটির বিস্ময়কর দায়িত্ববোধের কথা বলতে গিয়েই এই গল্পটি আমার কাছে করেছে'।

'ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে?'

'প্যারিসে'।

'গ্রুপটির কিংবা লোকটির কি নাম জানা গেছে?'

'নাম বলেনি, জিজ্ঞাসাও করিনি'।

'গল্পটি যে বলেছে সে কোথায়?'

'প্যারিস চলে গেছে'।

'গল্প বলা লোকটির নাম কি?'

'নাম ডুপ্লে'।

'ডুপ্লে?' আহমদ মুসার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'মনে হচ্ছে তুমি লোকটিকে চেন?'

'চিনি না। কিন্তু এই নামের সাথে আমি পরিচিত। এই নামের একজন লোক ফিলিস্তিন দুতাবাসে একটা চিঠি দিয়ে জানায় যে, ব্ল্যাক ক্রস ওমর বায়াকে কিডন্যাপ করেছে। ওমর বায়াকে যেখানে প্রথমে বন্দী করে রেখেচিল তার ঠিকানাও সে দেয়'।

'সেই ডুপ্লে এবং এই ডুপ্লে কি এক মানুষ হবে বলে তুমি মনে কর?'

'আমার তাই মনে হচ্ছে। কারণ ঘটনা ও নাম মিলে যাচ্ছে'।

কিন্তু এই ডুপ্লে 'ব্ল্যাক ক্রস'-এর খবর জানবে কি করে?'

'আমি মনে করি ডুপ্লে স্বয়ং 'ব্ল্যাক ক্রস'-এর লোক'।

'জানলে কি করে?'

'তার চিঠি পড়েই আমি অনুমান করেছি। আপনি কি এই ডুপ্লেকে কখনও খালি গায়ে দেখেছেন?'

‘একদম খালি গায়ে দেখিনি। তবে খেলার সময় গেঞ্জি গায়ে দেখেছি’।

‘তার গলায় কোন ক্রস ঝুলানো দেখেছেন?’

‘হ্যাঁ দেখেছি’।

‘রং কি কালো?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু তুমি জানলে কি করে?’

‘ব্ল্যাক ক্রস-এর এটা চিহ্ন। ব্ল্যাক ক্রস-এর প্রত্যেক সদস্যকে কার্বনের তৈরী কাল ক্রস পরতে হয়’।

জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক সহ সকলের মুখ বিস্ময়ে হা হয়ে গেল।

অনেকক্ষণ পর জিনার আব্বা বলল, ‘একদম আমাদের গায়ের ব্ল্যাক ক্রস! ভয় এবং বিস্ময় তার চোখে।

‘আমার একটা অনুমানের কথা বলি জনাব, ডুপ্লে মনের দিক দিয়ে দায়িত্বশীল ও দয়ালু লোক। ব্ল্যাক ক্রস-এর সাথে তার সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে। ব্ল্যাক ক্রস- এর হাতে ডুপ্লেকে প্রাণ দিতে হতে পারে’।

আঁৎকে উঠল মিঃ ফ্রাংক এবং সবাই।

কেউ কথা বলতে পারলো না।

আহমদ মুসাই আবার মুখ খুলল। বলল, ‘ডুপ্লে খুন হওয়ার আগেই তার সাথে আমার দেখা হওয়া প্রয়োজন। এই মুহুর্তে সেই আমার অবলম্বন। সে ব্ল্যাক ক্রস-এর কোন ঘাটি অথবা হেডকোয়ার্টার-এর ঠিকানা দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারে’।

‘ডুপ্লে সম্পর্কে এতটা নিশ্চিত তুমি কেমন করে হচ্ছে?

‘ঘটনার গতি তাই বলছে’।

একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর বলল, ‘ডুপ্লের প্যারিসের ঠিকানা আমি কেমন করে পাব জনাব?’

‘ওর স্ত্রী ও মেয়েও চলে গেছে, তবে তার ভাই-ভাবীরা এখানে আছে, তাদের সাথে দেখা করবে?

‘এটা ওদের জন্যেও ঠিক হবে না, আপনাদের জন্যেও ঠিক হবে না’।

‘কেন?’

‘ব্ল্যাক ক্রস যদি ওদের উপর চোখ রেখে থাকে কিংবা ওদের কেউ যদি ব্ল্যাক ক্রস-এর হয়ে থাকে?’

‘এ রকম কি হয়?’

‘ওমর বায়াকে তাদের ভাষায় যে ‘বিশ্বাসঘাতক’ সাহায্য করেছে, তাকে তারা খুজে বের করবেই। যদি বের করতে না পারে, তাহলে যাদের উপর তাদের সন্দেহ হবে প্রত্যেককেই তারা শেষ করে দেবে। এর আগ পর্যন্ত সন্দেহজনকদের উপর তারা চোখ রাখবেই’।

‘মনে হচ্ছে আপনি সব জানেন। কিভাবে ওদের কথা আপনি বলতে পারেন? বলল জিনা।

‘শত্রু সম্পর্কে কিছু অনুমান করতে না পারলে সেই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করব কেমন করে?’

‘এ পর্যন্ত ৭টি দেশ বা অঞ্চলের বিপ্লব বা পরিবর্তনে আপনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। অতীতের ঘটনার মধ্যে এমন ঘটনা কি আছে যা আপনার খুব মনে পড়ে বা আপনাকে কাঁদায়?’ জিনা প্রশ্ন করল।

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। মুখ নিচু করল। বলল, ‘এমন সহস্র ঘটনা আছে বোন। আমি সে সব ভুলে থাকতে চাই’।

‘কিন্তু ভুলে থাকা কি যায়? আমাদের তুমি ভুলতে পারবে?’ বলল জিনার আম্মা।

‘ভুলা যায় না আম্মা। কিন্তু দৃষ্টি যদি সামনের দিকটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাহলে দৃষ্টিটা অতীতে ফেরার সময় খুব কম পায়’।

‘আমাদের ভুলে যাবেন?’ জিনা বলল।

‘জীবন এমন একটা ফিল্ম বোন, এখানে যে ঘটনা একবার দাগ ফেরে তা আর মুছে যায় না’।

‘কিন্তু ফিল্মের ঘটনা দেখার জন্যে তা ঘুরাতে হয়’।

‘জীবন নামের ফিল্মটা সরল রেখার মত লম্বা, জন্ম থেকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত। এ ফিল্মকে ঘুরাতে হয় না। চোখ মেললেই দেখা যায়’।

‘ভাইয়া কিছু মনে করবেন না, আপনাকে দেখলে এবং আপনার কথা শুনলে আপনাকে একজন বন্দুকধারী মনে হয় না, মনে হয় আপনার হাতে আছে শিল্পীর কলম, চোখে আছে দার্শনিকের দৃষ্টি এবং মুখে আছে শিক্ষকের কথা’। জিনা বলল।

‘আমি এসব কিছু নই, আমি মানুষ এবং মানুষ বলেই আমি সবকিছু’।

‘ভাইয়া, আপনি আপনার এই কথাটা আবার বলুন। আমি লিখে নেব। লিখে আমি টাঙিয়ে রাখব’। বলে জিনা কলম বের করে কাগজ টেনে নিল। জিনা লিখে নিল কথাটা।

জিনার আব্বা বলল, ‘তুমি ঠিক বলেছ, ডুপ্লের বাড়িতে যাওয়া তোমার ঠিক নয়। কিন্তু আমরা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে ক্ষতি কি?’

‘ক্ষতি কিছু নেই। কিন্তু তাদের মনে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগবে কেন আপনারা তা চাচ্ছেন। ভবিষ্যতে কি ঘটবে জানি না। কিন্তু কিছু যদি ঘটে, তাহলে এই ঠিকানা চাওয়াটা বড় হয়ে দেখা দিতে পারে’।

জিনার আব্বা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল আহমদ মুসার দিকে। তারপর বলল, ‘সত্যিই তুমি বিস্ময়। এতদুর ভবিষ্যত তুমি দেখতে পাও?’

একটু থামল। তারপর আবার বলল, ‘ঠিকই বলেছ তুমি। কিন্তু ঠিকানা সংগ্রহের কি করা যায়?’

‘আব্বা, সেদিন ‘কম্যুনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম’-এর তিনি সদস্য হলেন। ওখানে তো তাঁর প্যারিসের ঠিকানা থাকতে পারে’। বলল মার্ক।

‘ঠিক বলেছ মার্ক। নিশ্চয় ওখানে আছে’। চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল জিনার আব্বার।

‘ঠিকানা তাড়াতাড়ি পেলে আমি বাধিত হবো জনাব’। বলল আহমদ মুসা।

‘অত তাড়া কেন? তুমি তো পুরোপুরি সুস্থ হওনি’। বলল জিনার আব্বা।

‘এত বিশ্রাম আমি বহুদিন নেইনি। শত্রুর হাতে একজন মানুষের দুঃসহ সময় কাটছে, তখন বিশ্রাম আরও বাড়ানো ঠিক নয়’।

‘তবুও ডাক্তারের মত তোমার নেয়া দরকার’। বলল জিনার আব্বা। বলে উঠে দাড়াল সে। সেই সাথে আহমদ মুসাও। জিনার আব্বা ভেতর বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করে বলল, ‘নিশ্চিন্ত থাক, ঠিকানা তাড়াতাড়িই পেয়ে যাব’।

জিনার আব্বার সাথে জিনার আম্মাও চলে গেল।

জিনা, মার্ক ও ফ্রান্সিসও উঠে দাড়িয়েছে।

আহমদ মুসা তার ঘরের দিকে হাঁটা শুরু করল।

‘ভাইয়া, আমাদের আপনি সবকিছু শিখিয়ে দিতে চেয়েছেন’। মুখ ভরা সংকোচ নিয়ে বলল ফ্রান্সিস।

আহমদ মুসা তার পিঠ চাপড়ে বলল, ‘আমি তোমাদের বাসায় যাব। গিয়ে শিখিয়ে দেব। লিখে দেব’।

‘তাহলে এখনি চলুন। আম্মা খুব খুশী হবেন’।

জিনা এবার বক্র দৃষ্টিতে ফ্রান্সিসের দিকে চাইল। অন্য সময় হলে ঝগড়া বাধিয়ে দিত। কিন্তু তা করল না। গম্ভীর সে। মুখটা অনেকখানি ভারি হয়ে উঠেছে। এক সাথে হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘ভাইয়া, আপনি বললেন জীবনটা সরল রেখার মত প্রলম্বিত, যদি এটা বৃত্তাকার হতো!’

‘কেন?’

‘তাহলে আবার দেখা হতো আপনার সাথে’।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। বলল, সরল রেখার পরিসরেও অনেক বৃত্ত রেখা আছে। যার ফলে জীবন পথে মানুষের ঘুরে-ফিরে দেখা হয়’।

‘দেখা হবে কি তাহলে আমাদের আবার?’

‘বৃত্তটির অংকন তোমার, আমার, আমাদের কারো হাতে নেই জিনা’।

‘কেন তাহলে স্নেহ-প্রীতির সৃষ্টি করা হলো? কেন আমরা ভাই, বোন ইত্যাদি সম্পর্ক গড়ি তাহলে?’

‘এটাই আমাদের আনন্দ এবং বেদনার পৃথিবী’।

‘কিন্তু এই বেদনা স্রষ্টা কেন দিলেন?’

‘মানুষের জন্যে যে চিরন্তন পুরষ্কার আল্লাহ রেখেছেন তার যোগ্য কে, তা দেখার জন্যে তো বেদনার পরীক্ষা প্রয়োজন’।

‘কিন্তু প্রভূ যিশু তো সবার পক্ষ থেকে বেদনার সে পরীক্ষা দিয়ে গেছেন’।

‘না জিনা, কেউ কারো পরীক্ষা দিতে পারে না। ফল যার পরীক্ষাও তার’।

‘ঠিক বলেছেন ভাইয়া, কিন্তু খৃষ্টান বিশ্বাস.....’। কথা শেষ না করেই থেকে গেল জিনা।

‘খৃষ্টান বিশ্বাস সম্পর্কে কোন মন্তব্য আমি করব না, ইসলামের বিশ্বাসের কথা তোমাকে আমি বললাম’। বলল আহমদ মুসা।

‘ধন্যবাদ ভাইয়া’। বলে জিনা ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে বলল, ‘স্বার্থপরের মত ভাইয়াকে যেন একা নিয়ে যেও না। ভাইয়া সেখানে যে পাঠ দেবেন, সে পাঠশালায় আমি এবং মার্ক যোগ দেব’।

‘ওয়েলকাম বোন’।

তারপর মুখ টিপে একটু হেসে আহমদ মুসা বলল, ‘ফ্রান্সিসের সাথে তোমার খুব ঝগড়া তো। আমিই তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাব’।

‘ঝগড়ার সৃষ্টি করে কিন্তু ফ্রান্সিস, ভাইয়া। আজকেই কিছু আগে...’।

‘জিনা, তোমার কান্ডজ্ঞান লোপ পাচ্ছে’। বলে জিনার কথায় বাধা দিল ফ্রান্সিস।

‘কান্ডজ্ঞান কার লোপ পাচ্ছে, এ প্রমাণ আজ তুমি দিয়েছ’। তীব্র কন্ঠে প্রতিবাদ করল জিনা।

আহমদ মুসা দু’হাত তুলে ওদের থামিয়ে দিয়ে হেসে বলল, ‘আমার খুব ইচ্ছা, তোমাদের ঝগড়া যেদিন এক মোহনায় এসে মিটে যাবে সেই শুভদিনে আমি যদি তোমাদের এক সাথে দেখতে পেতাম!’

ফ্রান্সিস মুখ নিচু করল। আর ‘ভাইয়া’ বলে চিৎকার করে উঠে লজ্জারাঙা মুখ লুকোতে দৌড় দিল জিনা।

আজ পালিয়ে গেলেও আহমদ মুসার বিদায়ের দিন জিনা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে বলেছিল, ‘সেদিন আপনার ডাকার জন্যে আমি ও ফ্রান্সিস আপনাকে কোথায় খুজে পাব ভাইয়া?’

তিনতলা বিরাট বাংলোর সামনের সবুজ চত্তরে বেরিয়ে এল মিঃ প্লাতিনি এবং ডোনা। এই কিছুক্ষণ আগে তারা এসে পৌছেছে দ্বিজন গ্রামে তাদের বাংলোতে। ক্লান্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন তাদের চোখে-মুখে।

তারা দ্বিজনে আসার আগে সুর লোরেতে বহু সময় কাটিয়েছে। বিভিন্ন জনকে জিজ্ঞাসা করে তারা ঘটনাস্থলে যায়। গাড়ি থেকে নেমে ঘটনার স্থান ও পাহাড় তারা দেখে। তারপর আশপাশের নানাজনকে জিজ্ঞাসা করেও আহমদ মুসা সম্পর্কে কোন তথ্য জোগাড় করতে তারা পারেনি। অবশেষে তারা চলে এসেছে দ্বিজন গ্রামে তাদের এস্টেটের খামার বাড়িতে।

তাদের আসার খবর পেয়ে গ্রামের গণ্যমান্য লোক এবং তাদের রায়ত (বর্গা প্রজা) এসেছে তাদের সাথে দেখা করার জন্যে। তাই বিশ্রাম না নিয়েই তাদের বেরিয়ে আসতে হয়েছে।

মিঃ প্লাতিনি এবং ডোনা বেরিয়ে আসতেই উপস্থিত সবাই সামনে ঝুকে মাথা নত করে বাও করল তাদের দু'জনকে। সকলের চোখে-মুখেই শ্রদ্ধার ভাব। তাদের মধ্য থেকে প্রবীণ একজন বলল, 'আমি আমার গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে আমাদের মহান রাজার স্মৃতি প্রিন্স মিশেল প্লাতিনি ডি বেরী লুই এবং তাঁর কন্যা প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফফাইন লুইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের সকলের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন'।

উল্লেখ্য, ডোনার পারিবারিক নাম প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই। কিন্তু কাগজে-কলমে সে ডোনা জোসেফাইন নামে পরিচিত আর ডোনার আব্বার পারিবারিক নামের সাথে ডি বেরী যুক্ত আছে অফিসিয়াল নামে নেই।

ডোনাদের পরিবার ফ্রান্সের অত্যন্ত পুরাতন শাসক পরিবার। ফ্রান্সের প্রাচীন বুরবো রাজবংশের উত্তরাধিকারী তারা। ফরাসী বিপ্লবোত্তর কালে ১৮১৫ সালে ফ্রান্সে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে বুরবো রাজবংশের অষ্টাদশ লুই ক্ষমতায় আসেন। তিনি রাজতন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসলেও রাজতন্ত্রীদের তিনি পছন্দ করেননি, যথাসাধ্য তাদের আমল দেননি। বরং তিনি সাহায্য সহযোগিতা

করেছেন গনতন্ত্রীদের। তার ফলে রাজতন্ত্রীদের প্রবল চাপের মধ্যে থাকলেও তাঁর শাসনকালের অধিকাংশ সময় মানুষের গণতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্রাট অষ্টাদশ লুইয়ের উত্তরাধিকারী যুবরাজ ডিউক ডি বেরী ছিলেন পিতার চেয়েও গণতন্ত্রী। তিনি রাজতন্ত্রীদের হাতে নিহত হন। এই যুবরাজ ডিউক ডি বেরী ডোনাদের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরী। ডিউক ডি বেরীর উত্তরসূরী এই পরিবারকে ফ্রান্সের লোকেরা ভালোবাসে। পরিবারটি প্যারিসের বদলে অধিকাংশ সময় জনগণের মধ্যে গ্রামে বাস করে। দক্ষিণ ফ্রান্সের মন্ট্রেজুতে ডোনাদের একটা বাড়ি আছে।

মিঃ প্লাতিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডোনাকে নিয়ে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসলো। তাদের সামনে অনেকগুলো চেয়ার পাতা। মিঃ প্লাতিনি সবাইকে বসতে বললেন।

সবাই বসল। কিন্তু বরাবরের মত সবাই চেয়ারে না বসে সবুজ চত্তরের উপর বিছানো কার্পেটে গিয়ে বসল।

মিঃ প্লাতিনি ও ডোনা এতে আপত্তি করে তাদেরকে চেয়ারে উঠে বসার অনুরোধ করল।

তাদের মধ্য থেকে প্রবীণ সেই বৃদ্ধ উঠে দাড়িয়ে বলল, ‘আমাদের মাফ করবেন। আমরা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সম্মান প্রদর্শন করছি। আমনারা একটা প্রতীকমাত্র’।

গ্রামবাসী গণ্যমান্যদের মধ্যে জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক মরিসও ছিল।

কুশল বিনিময় শেষে কিছু গল্পগুজবের পর সবাই উঠল।

একে একে সবাই এসে বাও করল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেল ডোনাদের সবুজ চত্তর।

‘আব্বা, ওদের কাউকে সুর লোরের ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা করলে হতো না’।

‘হতো। কিন্তু কথাটা আমি তুলবো সবার সামনে। আমরা একটু বিশ্রাম নেই। তারপর ডেকে ‘খোঁজ-খবর নেয়া যাবে’।

মিঃ প্লাতিনি এবং ডোনা বাংলোর ভেতরে এল। উঠে এল তারা দু'তলায়। ডোনা তার আব্বাকে দু'তলায় তার কক্ষে রেখে নিজে উঠে গেল তিন তলায় তার কক্ষে।

তিন তলার সর্ব দক্ষিণে ডোনার শোয়ার ঘর। ঘরটির দক্ষিণে একটা ব্যালকনি। ডোনা কাপড় চেঞ্জ করে হাত-মুখ ধুয়ে সাজানো নাস্তা খেয়ে নিয়ে ব্যালকনির ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

ডোনা চেয়েছিল চোখ বন্ধ করে একটু রেস্ট নেবে। কিন্তু বাইরের দৃশ্যের দিকে চোখ পড়ার পর সে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না।

বলা যায় তাদের বাড়ির গা ঘেষেই বয়ে যাচ্ছে এদেঁরে নদী। তারপর দিগন্ত প্রসারিত সবুজ উপত্যকা। আর তাদের বাড়ির দু'পাশ দিয়ে উঁচু-নিচু পাহাড়, টিলার উপর ছবির মত সুন্দর গ্রাম। ঘন সবুজ গাছের ফাকে ফাকে বাড়িগুলিকে পটে আকা ছবির মতই সুন্দর মনে হচ্ছে।

ডোনা সম্মোহিতের মত তাকিয়ে রইল এই অপরূপ দৃশ্যের দিকে।

হঠাৎ কয়েকটা শব্দ এসে ডোনার কানে প্রবেশ করল। একটা নারী কন্ঠ বলছে, 'আবার হাত দিবি না, এতে কোরআনের উদ্ধৃতি আছে'।

তড়াক করে শোয়া অবস্থা থেকে লাফিয়ে উঠল ডোনা। মুসলমানদের কোরআনের কথা বলছে ওরা কারা?

ডোনা এক লাফে গিয়ে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল। নিচে তাকিয়ে দেখতে পেল, ডোনাদের বাড়ির ধার ঘেঁষে নদী তীরের রাস্তা দিয়ে তিনজন তরুণ-তরুণী এগিয়ে যাচ্ছে। তরুণীটির হাতে একটা বই। ডোনা বুঝতে পারল বই হাতে মেয়েটিই কথা বলে দু'জন তরুণের কাউকে হয়তো বারণ করেছে বইয়ে হাত দিতে। ডোনা ভাবল, এদের কেউ মুসলমান অথবা তিনজনই মুসলমান। এটা ভাবার সাথে সাথেই ডোনার মনে একটা কথা ঝিলিক দিয়ে উঠল, এরা মুসলমান যখন, তখন আহমদ মুসা আশে পাশে কোথাও থাকলে এরা অবশ্যই জানবে। তাছাড়া আহমদ মুসাকে খোঁজার ব্যাপারে এদের কাজে লাগানোও যাবে।

ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই ডোনা রেলিং থেকে মুখ বাড়িয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে, 'হ্যালো, আপনারা কি দয়া করে একটু উপরে আসতে পারেন?'

তিনজনেই এক সঙ্গে উপর দিকে তাকাল এবং দেখতে পেল ডোনাকে। দেখতে পাওয়ার সংগে সংগে নিচে থেকেই তারা সামনের দিকে ঝুঁকে এক সাথে বাও করলো ডোনাকে।

তারপর তিনজনের মধ্যে থেকে মেয়েটি উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সম্মানিতা প্রিন্সেস, আপনি ইচ্ছা করলে আমরা অবশ্যই আসব'।

'ওয়েলকাম। খুব খুশী হব আপনারা এলে'।

তারপর ডোনা ব্যালকনি থেকে তার ঘরে ফিরে এসে ইন্টারকমে নিচতলার সার্ভিস পুলকে নির্দেশ দিল ঐ তিনজন মেহমানকে তার ঘরে নিয়ে আসতে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ডোনা তার কক্ষের বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ পেল।

ডোনা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। দেখল, বেয়ারা ড্রইং রুম খুলে দিচ্ছে। তার পেছনে দাড়িয়ে দু'জন তরুণ ও একজন তরুণী। তিনজন প্রায় সমবয়সী। ডোনাকে দেখেই তাদের চোখে-মুখে একটা সংকোচ ও শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল। তারা বাও করলো ডোনাকে।

'ওয়েলকাম, ফ্রেন্ডস'। বলল ডোনা।

ওদেরকে নিয়ে ডোনা তার ড্রইং রুমে গিয়ে বসল।

'আপনারা তো এই গ্রামেরই?' প্রথমেই কথা বলল ডোনা।

'জি'। উত্তর দিল জিনা। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি জিনা লুইসা' মার্ককে দেখিয়ে বলল, 'ও মার্ক মরিস, আমার ছোট ভাই' এবং ফ্রান্সিসকে দেখিয়ে বলল, 'ও ফ্রান্সিস, আমার বন্ধু'।

আমি 'ডোনা জোসেফাইন'। বলল ডোনা।

'মাফ করবেন প্রিন্সেস, আপনি আমাদের কাছে 'প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই'। বলল জিনা সসংকোচে।

'একই কথা'। বলল ডোনা।

‘সরি। এক কথা নয় প্রিন্সেস। আপনার পারিবারিক নামের মধ্যে আমাদের জন্যে একটা গৌরব আছে। এর দ্বারা আমাদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে আমাদের বর্তমানের একটা সংযোগ ঘটে’। বলল জিনা।

‘আপনি খুব সুন্দর কথা বলেন। কিন্তু দেখুন, রাজতান্ত্রিক ইতিহাস স্মরণ করার মধ্যে কতটুকু গৌরব আছে?’ বলল ডোনা।

‘রাজতন্ত্রের যুগে রাজতন্ত্র ছিল, আজ গণতন্ত্রের যুগে গণতন্ত্র। দুইয়ের ঐতিহাসিক মুল্য একই। তাছাড়া মহামান্য সম্রাট অষ্টাদশ লুই সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রীই ছিলেন, সেই যুগে যতটুকু সম্ভব ছিল। আর তাঁর সন্তান এবং আপনাদের প্রত্যক্ষ পুরুষ মহামান্য যুবরাজ ডিউক ডি বেরীকে তো গণতন্ত্রী হওয়ার কারণেই জীবন দিতে হয়েছে। তাকে গোটা দেশ শ্রদ্ধা করে, স্মরণ করে প্রিন্সেস’।

‘ধন্যবাদ’। বলল ডোনা।

মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থাকল ডোনা। তারপর ওদের দিকে একবার নজর বুলিয়ে বলল, ‘আপনাদের নাম শুনে কাউকে মুসলমান বলে মনে হলো না? কিন্তু আপনার মুখ থেকে আমি মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ ‘কোরআন’-এর নাম শুনেছি’।

জিনাসহ তিনজনের মুখই মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল। নিচু হলো তাদের মুখ। কথা বললো না তারা।

‘আপনারা বা আপনাদের মধ্যে কেউ বা গ্রামে কোন মুসলমান আছে?’ ‘কোরআন’-এর নাম আপনারা কোত্থেকে জানতে পারলেন?’

জিনাসহ তিনজনের মুখই শুকনো হয়ে উঠেছে। তাদের চোখে-মুখে প্রবল একটা অস্বস্তি।

‘দেখুন, আমি খারাপ দৃষ্টিতে এ প্রশ্ন করছি না। এ বিষয়টা জানা আমার খুবই প্রয়োজন। আপনারা আমাকে সাহায্য করুন’। এবার অনুরোধ ঝরে পড়ল ডোনার কন্ঠে।

জিনার চেহারায় কিছুটা উজ্জ্বলতা ফিরে এল। কিন্তু ফ্রান্সিসের মুখ তখনও অন্ধকার।

জিনা ফ্রান্সিসের দিকে ইংগিত করে বলল, ‘এ মুসলিম। নাম ফ্রান্সিস আবুবকর। আমাদের গ্রামে এই একটা পরিবারই মুসলমান’।

‘ওয়েলকাম’। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল ডোনা। ডোনার মুখে ঈষৎ হাসি। বলল, ‘কিছু মনে করবেন না, আমার প্রশ্নে আপনারা অস্বস্তিবোধ করছিলেন কেন?’

জিনার ঠোটেঁ সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘সম্মানিতা প্রিন্সেস, আপনি সব জানেন। মুসলিম পরিচয় দেয়া আগের মত আর নিরাপদ নয়। সাম্প্রতিক ফরাসি সরকারগুলো মুসলমানদের একটু বৈরিতার দৃষ্টিতে দেখছে। অতীতে এমনটা ছিল না। আপনি জানেন, স্কুল-কলেজে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের প্রার্থনা করার অধিকার, মাথায় ওড়না দেয়ার অধিকার ইত্যাদি হরণ কথা হয়েছে’।

‘আরো আছে, মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় বক্তৃতার উপরও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হচ্ছে, তাদের ধর্মীয় বক্তৃতার উপরও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হচ্ছে, তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তৈরীকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে’। ঈষৎ হেসে কথাগুলো যোগ করল ডোনা।

জিনাসহ তিনজনের চোখে-মুখেই ফুটে উঠল বিস্ময়। কোন কথা তারা বলল না।

ডোনাই আবার কথা বলল, ‘এর প্রকৃত কারণ কি জানেন? প্রকৃত কারণ হলো, ফ্রান্সের নীতি নির্ধারকরা মনে করেছিলেন মুসলমানদেরকে ইসলাম ভুলিয়ে দেয়া যাবে। কিন্তু শত চেষ্টার পরেও দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তাই ফ্রান্সের ষাট লাখ মুসলমানকে ফ্রান্সের একটা মহল হিংসা করতে শুরু করেছে। এই হিংসারই ফল ঐ পদক্ষেপগুলো’।

‘আপনি প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন হয়ে এই কথা বলছেন?’ বলল মার্ক।

‘কেন বলব না? আমি তো ঐ হিংসুকদের দলে নই?’

সেই বইটি তখনও জিনার হাতে।

সে নাড়াচাড়া করছিল বই।

ডোনা কয়েকবার তাকিয়েছে বইটির দিকে। এবার মার্কের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ডোনা বলল, ‘বইটা একটু দেখতে পারি আমি?’

জিনা যেন একটু অপ্রস্তুত হলো। সে এক নজর ফ্রান্সিসের দিকে চেয়ে বইটি তুলে দিল ডোনার হাতে। ডোনা তো অজু করেনি, তার হাতে বই দেবে কিনা এটাই ছিল জিনার দ্বিধা।

ডোনা বইটি হাতে নিয়ে পাতা উল্টাল। প্রথম কভার-পাতা উল্টাতেই কয়েক শিট কাগজ বেরিয়ে পড়ল। শিটগুলো ভর্তি লেখা। হাতের লেখা। লেখাগুলোর দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল ডোনা। পরিচিত হস্তাক্ষর। আরো একটু ভালো করে দেখল। মুসলমানদের কিছু রীতি-নীতির বিষয়ে লিখা।

লেখাগুলো ভালো করে দেখতে গিয়ে সমগ্র শরীরে একটা তড়িৎপ্রবাহ খেলে গেল। একদম আহমদ মুসার লেখার মতই লেখাগুলো। বুকটা ধক ধক করে উঠল ডোনার। তার কন্ঠ চিরেই যেন বেরিয়ে এল, 'এই লেখা কার?' আর্ত চিৎকারের মত ডোনার কন্ঠ।

জিনা এবং ওরা চমকে উঠল ডোনার কন্ঠস্বরে। চমকে ওঠা ভাব কেটে গেলে ডোনার চেহারায় উত্তেজনা ও অস্থির ভাব ফুটে উঠতে দেখল। ওরা সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে ওরা তাকাল ডোনার দিকে।

প্রথম প্রশ্ন শেষ করেই ডোনার আরেকটা প্রশ্ন, 'এটা কি আপনাদের কারও লেখা?'

'না'। শুকনো কন্ঠে জিনা বলল।

'এ গ্রামের কারও'।

'না'।

'তাহলে কে লিখেছে?'

জিনা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না। তার মুখটা পাংশু হয়ে উঠেছে। আহমদ মুসার কথা তারা কাউকে জানায়নি। এটা এর কাছে প্রকাশ করা কি ঠিক হবে। এদের যোগাযোগ সরকারের সাথে আছে, ব্ল্যাক ক্রসের সাথেও থাকতে পারে।

জিনার এসব চিন্তার মধ্যেই ডোনার আরেকটা প্রশ্ন ছুটে এল 'কে লিখেছে, দয়া করে বলুন'।

'আমাদের একজন মেহমান লিখেছিলেন?'

'মেহমান? কি নাম?'

জবাব দিল না জিনা। কি জবাব দেবে সে?

অস্থির ডোনাই আবার প্রশ্ন করল, 'তিনি কি মুসলমান?'

'জি'। জিনা বলল।

'তিনি কি এশিয়ান?'

'জি'। ডোনার প্রশ্নে বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে জিনার চোখ। তার সাথে ভয়ও। তবে সে আশ্বস্ত হচ্ছে ডোনার চোখ-মুখ দেখে। সেখানে ক্রোধ নেই, বিদ্বেষ নেই বরং আছে আশার একটা আকুলতা।

'সে কি আহত ছিল?'

বিস্ময়ে প্রায় বাক-রুদ্ধ জিনা বলল, 'আপনি... আপনি... জানলেন কি করে এসব কথা?'

জিনার এ কথার দিকে ডোনা ভ্রুক্ষেপ মাত্রও করল না। আবেগে-উত্তেজনায় তার ঠোট কাঁপছে। কম্পিত কন্ঠে বলল, 'তাঁর নাম কি আহমদ মুসা?'

কোন কথা যোগাল না জিনার কন্ঠে। সে, মার্ক এবং ফ্রান্সিস ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল ডোনার দিকে। জগতের সব বিস্ময় এসে যেন জমা হয়েছে তাদের চোখে। কি করে এটা সম্ভব! কোথায় প্রিন্সেস মারিয়া জোসেফাইন লুই, আর কোথায় বিদেশী মুসলিম মুক্তি সংগ্রামী আহমদ মুসা! আহমদ মুসার নাম কি করে আসে তাদের প্রিন্সেসের মুখ থেকে। শুধু নাম আসা নয়, তাদের প্রিন্সেসের চোখে যে আবেগ এবং আকুলতা তারা দেখতে পাচ্ছে তা নাটকে রোমিওর জন্যে জুলিয়েটের এবং ফরহাদের জন্যে শিরির আকুলতায় তারা দেখেছে।

ডোনা উঠে দাড়িয়ে ছুটে গেল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকা জিনার কাছে। তারপর কার্পেটের উপর হাঁটু গেড়ে বসে জিনার দু'টি হাত চেপে ধরে বলল, 'বলুন, আমি ঠিক বলেছি'।

জিনা তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে নেমে মাথা ঝুকিয়ে ডোনাকে বাও করে তার পায়ের কাছে বসে বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, তিনি আহমদ মুসা'।

তারপর উঠে দাড়িয়ে ছুটে গেল ইন্টারকমের কাছে।

মার্ক এবং ফ্রান্সিস চেয়ার থেকে উঠে দাড়িয়ে অভিভূতের মত তাকিয়ে আছে তাদের প্রিন্সেসের দিকে। তারা কিছুতেই ডোনার সাথে আহমদ মুসার কোন হিসেব মেলাতে পারছে না।

ডোনা টেলিফোনে উত্তেজিত কন্ঠে বলল, ‘আব্বু, আহমদ মুসার সন্ধান মিলেছে, তুমি এস’।

ইন্টারকম থেকে সরে এসে সবাইকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে বলল ডোনা, ‘আপনারা বসুন’।

কিন্তু কেউ বসল না। তারা মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে দরজার দিকে। তারা ডোনার আব্বা মিঃ প্লাতিনির অপেক্ষা করছে।

ডোনা বসল তার চেয়ারে।

এই সময় ঘরে প্রবেশ করল মিঃ প্লাতিনি।

জিনা, মার্ক, ফ্রান্সিস ঝুকে পড়ে সসম্মানে বাও করল প্রিন্স মিশেল প্লাতিনি ডি বেরী লুইকে।

ডোনা উঠে দাড়িয়ে তার আব্বাকে স্বাগত জানিয়ে জিনাদের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিল এবং বইয়ের ভেতর পাওয়া শিটগুলোর লেখা দেখিয়ে বলল, ‘এটা আহমদ মুসার লেখা’। তারপর ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল তার আব্বাকে।

চোখ ভরা বিস্ময় নিয়ে ডোনার আব্বা চেয়ারে বসল এবং সবাইকে বসতে বলল।

ডোনা বসল তার চেয়ারে এবং জিনারা বসল গিয়ে কার্পেটের উপর।

‘ও কোথায়?’ ডোনার দিকে চেয়েই প্রশ্ন করল ডোনার আব্বা।

‘ওঁর এই খোঁজ পেয়েই তোমাকে ডেকেছি আব্বা। আমি ওদের জিজ্ঞাসা করিনি এখনও’। বলে ডোনা তাকাল জিনার দিকে।

জিনা উঠে দাঁড়াল। ডোনা ও ডোনার আব্বার দিকে মাথা ঝুকিয়ে একবার বাও করে বলল, ‘মহামান্য স্যার, আহমদ মুসা ভাইয়া গতকাল সকালে চলে গেছেন’।

‘চলে গেছেন?’ ডোনা ও ডোনার আব্বা এক সাথেই বলে উঠল।

ডোনার আব্বার মুখটা ম্লান হয়ে গেল। আর হঠাৎ করেই যেন চুপসে গেল ডোনার মুখ। হতাশার একটা কালো মেঘ যেন এসে ছেয়ে ফেলল তার চেহারাকে।

'জি হ্যাঁ, স্যার'। বলল জিনা।

'কোথায় গেছেন?' বলল ডোনা। চোখে-মুখে তার আকুল ব্যগ্রতা।

'প্যারিসে'।

'প্যারিসে কোথায়?' বলল ডোনার আব্বা।

'তা বলে যাননি। তবে তিনি একটা ঠিকানা নিয়ে গেছেন'।

'কার ঠিকানা?' বলল ডোনা।

'ঠিকানাটা ব্ল্যাক ক্রস-এর একজন লোকের, যিনি ওমর বায়া সম্পর্কে খোঁজ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন ফিলিস্তিন দুতাবাসকে'।

'ঠিকানাটা কি পাওয়া যাবে?' জিজ্ঞাসা করল ডোনা।

'ঠিকানাটা আব্বা দিতে পারেন'। বলল জিনা।

'কে তোমার আব্বা?' জিজ্ঞাসা করল ডোনার আব্বা।

'মিঃ ফ্রাংক মরিস'। জবাব দিল জিনা।

'ও আচ্ছা'। বলল ডোনার আব্বা।

ডোনা ও ডোনার আব্বা নিচু স্বরে মত বিনিময় করল। তারপর ডোনার আব্বা জিনাকে বলল, 'তোমার বাড়িতে তোমার আব্বার কাছে আমাকে কি নিয়ে যাবে?'

জিনা সলজ্জ মুখে ডোনার আব্বাকে বাও করে বলল, 'লজ্জা দেবেন না মহামান্য স্যার, আমার আব্বাই আসবেন। কখন আসতে হবে স্যার?'

'এখনি হলে ভাল হয়'। বলল ডোনার আব্বা।

মার্ক জিনাকে বলল, 'আপা, আমি ও ফ্রান্সিস যাই আব্বাকে নিয়ে আসি'।

'ধন্যবাদ মার্ক, তাহলে এখনি তোমরা যাও'।

মার্ক ও ফ্রান্সিস ডোনা ও ডোনার আব্বাকে বাও করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডোনার আব্বা উঠে দাড়াল। বলল, 'তোমরা বসে গল্প কর। একটা জরুরী কাজ সেরে আসছি'। বলে ডোনার আব্বা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ডোনাও উঠল। জিনাকে কার্পেট থেকে তুলে তাকে নিয়ে সোফায় বসল।

জিনা তার পাশাপাশি বসতে অস্বীকার করে বলল, 'যার যে স্থান তাকে সে স্থান দেয়াই সভ্যতা। আমরা ফরাসীরা অসভ্য নই'। বসে জিনা ডোনার পাশ ঘেঁষে কার্পেটে বসে পড়ল।

ডোনা জিনার একটা হাত হাতে নিয়ে বলল, 'তোমার কাছে আমার অনেক জিজ্ঞাসা'।

'বলুন'। বলল জিনা।

'আহমদ মুসা তোমাদের ওখানেই ছিল তাই না?'

'হ্যাঁ, কি করে জানলেন?'

'তাকে তোমার ভাই বলা থেকে। এখন বল ওর কাহিনী'।

'আমরা সুর লোরের এক পাহাড়ে পিকনিক করছিলাম। আম্মা, আব্বা, আমি ও মার্ক। দূরবীণে দেখছিলাম চারদিকটা। হঠাৎ দেখলাম একটা গাড়িকে আরেকটা গাড়ি তাড়া করে এল। সামনের পাহাড়ে তারা নামল। তারপর সংঘাত হলো দীর্ঘ আধ ঘন্টা ধরে। একদিকে একজন, অন্য দিকে আর সবাই। জিতে গেল একজনের পক্ষটাই। ও পক্ষে দশজন নিহত হলো। কিন্তু ঐ একজন পায়ে গুলীবিদ্ধ হয়ে আহত হলো। আমরা দূরবীণে সব দেখলাম। শেষে দেখলাম, ঐ একজন হামাগুড়ি দিয়ে গাড়িতে উঠে গাড়ি চালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। গাড়িটা এসে ধাক্কা খেল আমাদের পাহাড়ের গোড়ায়। আমরা সবাই ছুটে গেলাম। দেখলাম লোকটি ড্রাইভিং সিটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আমরা উদ্ধার করে নিয়ে এলাম তাকে। ইনিই যে আহমদ মুসা তা আমরা জানতে পারলাম তিনি চলে যাবার দু'দিন আগে'।

'ঔ সংজ্ঞাহীন হয়েছিলেন কেন?' ভারী ও কাঁপা কন্ঠস্বর ডোনার।

কন্ঠস্বরে চমকে উঠে জিনা তাকাল ডোনার দিকে। দেখল, তার দু'চোখ দিয়ে নিঃশব্দে অশ্রু গড়াচ্ছে। জিনা আগেই বুঝেছিল ব্যাপারটা। কিন্তু সম্পর্কটা এত গভীর তা কল্পনা করেনি। তার মনে একটা প্রশ্ন কাঁটার মত বিঁধছিল, সেটা আরও তীব্র হয়ে উঠল। তাদের প্রিন্সেস-এর সাথে বিদেশী ও মুসলিম আহমদ মুসার সম্পর্ক হলো কি থেঁতলানো....'।

জিনা কথা শেষ করতে পারলো না। ডোনা তার মুখে হাত চাপা দিয়ে বন্ধ করে দিল তার কথা। বলল, 'এসব আর শুনতে পারছি না বোন। তার চেয়ে বল কিভাবে ছিলেন, কি কি করেছেন। তোমরা তাকে কেমন দেখেছ'।

জিনা ধীরে ধীরে তার মনে থাকা প্রতিদিনের সব কাহিনী, সব কথা বর্ণনা করল। আহমদ মুসাকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সিসের সাথে তার গন্ডগোলের কথা, পরে ফ্রান্সিস লজ্জিত হবার কথা কিছুই সে বাদ দিল না। তারপর বলল, 'সবাই একমত, ওঁর চেয়ে বিস্ময়কর মানুষ কেউ কোথাও দেখেনি। মানুষকে আপন করে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা তার'।

থামল জিনা।

এই সময় ইন্টারকম কথা বলে উঠল। ডোনার আব্বার কন্ঠঃ 'মা, জিনার আব্বা মিঃ ফ্রাংক এসেছিলেন। ঠিকানা পাওয়া গেছে'।

'তাহলে এখনই আমরা প্যারিস রওয়ানা হবো আব্বা। তুমি ড্রাইভারকে রেডি হতে বল'।

'ঠিক আছে মা'।

বন্ধ হয়ে গেল ইন্টারকম।

'আপনারা এখনি যাবেন প্রিন্সেস?'

'দেখ, তুমি আহমদ মুসার বোন নও?'

'হ্যাঁ'। বলল জিনা।

'তাহলে তুমি আমার বোন নও?'

'হ্যাঁ'।

'এরপর প্রিন্সেস আর বলবে?'

জিনা মাথা ঝুকিয়ে বাও করল ডোনাকে এবং বলল, 'বলব না'।

একঘন্টার মধ্যে ডোনা ও ডোনার আব্বা তৈরী হয়ে বেরিয়ে এল।

গাড়ি প্রস্তুত।

মার্ক ও ফ্রান্সিস দাড়িয়ে আছে চত্তরের এক পাশে। গ্রামের কয়েকজন গণ্যমান্য লোকও এসেছে। জিনা ডোনার পাশে।

সবাই বাও করে বিদায় জানাল তাদের প্রিন্স এবং প্রিন্সেসকে।

জিনা বাও করে সোজা হয়ে দাড়াল ডোনা তাকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলল, 'আহমদ মুসাকে দাওয়াত দিয়েছ, আমাকে দিলে না?'

'কিসের দাওয়াত?' বলল জিনা।

'তোমার ও ফ্রান্সিসের শুভদিনের?'

মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল জিনার। বলল, ভাইয়া কি ভাবীকে ছেড়ে আসতে পারেন?

'ওরে দুষ্ট' বলে পিঠে একটা কিল দিয়ে ডোনা গাড়িতে গিয়ে উঠল।

পূর্ব প্যারিস। শোন নদীর প্রথম ব্রীজ থেকে দু'শ গজ উত্তরে একটা অখ্যাত গলির মুখে দাড়িয়ে সুদৃশ্য প্রাসাদ তুল্য একটা বাড়ি। দাড়িয়ে আছে শোনের দিকে মুখ করে। এই বাড়িরই শীর্ষ তিনটি ফ্লোর নিয়ে ব্ল্যাক ক্রস-এর প্যারিস হেডকোয়ার্টার। নিচের ফ্লোরগুলোকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করছে ব্ল্যাক ক্রস।

শীর্ষ ফ্লোরের একটা বিরাট কক্ষ।

সেই কক্ষের বিরাট টেবিলের পেছনে দৈত্যাকার রিভলভিং চেয়ারে ঠেস দিয়ে দাড়িয়ে ব্ল্যাক ক্রস এর প্রধান পিয়েরে পল রাগে ফুসছে। আর টেবিলের ওপাশে ধরাপড়া চোরের মত পাংশু মুখে দাড়িয়ে আছে ফ্রান্স এলাকার ব্ল্যাক ক্রস অপারেশন কমান্ডার মিঃ জিয়ান টুর্গো।

মিঃ পিয়েরে পল ক্রোধে চোখ-মুখ লাল করে তীব্র কন্ঠে বলছিল, 'কে একজন লোক প্যারিসে আমাদের তিনজনকে মারল, জাহাজে হত্যা করল দশজনকে, নানতেজের ঘাটিতে আরও তিনজনকে এবং সুর লোরেতে হত্যা করল আরও নয় জনকে, আর তোমরা বসে ঘোড়ার ঘাস ঘাটছ!'

'স্যার লোকটাকে ঘরেও আটকানো যায়নি'। মুখ কাঁচু-মাচু করে বলল জিয়ান।

'আটকানো যাবে কেন? তোমরা তো শেয়ালের বাচ্চা, আর সে সিংহের বাচ্চা। লজ্জা করে না এসব কথা বলতে?'

'স্যার, আমাদের লোকদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। তাদের জীবন দেয়াই তো তার প্রমাণ'।

'আর বলো না এসব কথা। মরে তো গরু ছাগল ধরনের লোকরাই'।

'লোকটা ভয়ানক ধূর্ত স্যার?'

'এর অর্থ তোমরা ভয়ানক বোকা? তার নামে তোমরা জানতে পেরেছ?'

'না স্যার'।

'অপদার্থের দল। গোটা একটা রাত, একটা দিন তোমাদের হাতে ছিল লোকটা, আর তার নাম জানতে পারনি!'

'স্যার, যারা তার সাথে কথা বলেছে তারা কেউ বেঁচে নেই স্যার।

'লজ্জা করছে না এসব কথা বলতে। তাকে খুজে বের করার কি ব্যবস্থা করলে?'

'তার চেহারার সঠিক বর্ণনা কেউ দিতে পারছে না স্যার। ব্ল্যাক ক্রস-এর যে ড্রাইভার তাকে সুর লোরে নিয়ে গিয়েছিল, সে বলছে লোকটির চেহারার দিকে ভালো করে সে তাকায়নি। আর জাহাজের যারা বেঁচে আছে, তারা বিভিন্ন বর্ণনা দিচ্ছে। তারা বলছে তারা নাকি লোকটার মুখের দিকে তখন তাকাবারই সাহস পায়নি'।

'তোমার লোকেরা এমন অপদার্থ হলে তুমি কি? বড় অপদার্থ নও? জান লোকটা কোন দেশী?'

'স্যার, কেউ বলে তুর্কি, কেউ বলে চীনা, কেউ বলে আরবী, কারও কারও মতে সে বলকান কিংবা ইউরোপেরও হতে পারে'।

টেবিলে একটা প্রচন্ড ঘুষি মেরে চোখে আগুন ঝরিয়ে বলল, 'গর্দভ, একজন লোকের এত দেশের চেহারা হয় কি করে?'

'স্যার, ফরাসি গোয়েন্দা দফতরের সাহায্য নিলে হয় না। ওদের হাতে সব ক্রিমিনালের ছবি আছে। সেগুলো দেখলে হয়তো আইডেনটিফাই করা যাবে'।

'ও! তুমি দেখছি একজন ফুঁচকে খুনিকে কার্লোস বানাতে চাও!'

এই সময় দরজায় নক হলো।

মিঃ পিয়েরে সোজা হয়ে দাড়িয়ে চেয়ারে ফিরে এল। তাকাল পাশের ছোট্ট টিভি স্ক্রিনের দিকে। তার মুখটা প্রষন্ন হয়ে উঠল। চেয়ারের হাতলের সাথে সেট করা একটা বোতাম চাপ দিল পিয়েরে পল। অমনি দরজা খুলে গেল।

ঘরে প্রবেশ করল 'ওকুয়া' প্রধান মাইকেল সোম্বা।

'যাও কাজ করগে। জিয়ান টুটোর দিকে তাকিয়ে বলল পিয়েরে পল।

জিয়ান বেরিয়ে গেল।

মিঃ পিয়েরে উঠে দাড়িয়ে স্বাগত জানাল মাইকেল সোম্বাকে।

দু'জন বসল।

প্রথমেই কথা বলল সোম্বা, 'কেমন আছেন মিঃ পল?'

'না, ভালো নেই মিঃ সোম্বা। গত কয়েকদিন আমরা আমাদের তিন ডজন লোক হারিয়েছি'।

'হ্যাঁ, আমি শুনলাম এই কথা। উপদ্রবটি কোত্থেকে আমদানি হলো?'

'আমরা বুঝতে পারছি না। আমাদের ঘাটিতে ঢুকেছিল চুরি বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে। আমাদের হাতে ধরা পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ওর হাতে আমাদের ৩৪ জন লোক মারা পড়ল, কিন্তু তাকে আমরা কিছুই করতে পারলাম না'।

'সাংঘাতিক ব্যাপারতো!'

'হ্যাঁ, এ ব্যাপার নিয়েই এতক্ষণ ধমকালাম আমাদের অপারেশন কমান্ডারকে। যাক, কাজের কথায় আসা যাক'।

'ফাদার ফ্রান্সিস বাইককে যে কথা বলেছিলেন, সে ব্যাপারে নাকি অনেকদুর এগিয়েছেন?'

'অনেকদুর মানে আসল কাজ হয়ে গেছে'।

'সেটা কি?'

'ব্যাপারটা আমিও ঠিক বুঝি না। মানুষের উপর মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাকে হাতের মুঠোয় আনার বৈজ্ঞানিক কৌশল আবিস্কৃত হয়েছে। ওমর বায়ার উপর আমরা এই কৌশলই প্রয়োগ করতে চাচ্ছি। এতে সে স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে চলে আসবে এবং আমরা তাকে যে আদেশ করব তাই সে পালন করবে'।

'এটা সম্ভব?' চোখ কপালে তুলে বলল মাইকেল সোম্বা।

'সম্ভব' কিন্তু এই জটিল কাজের জন্যে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ কয়েকজন মাত্র দুনিয়াতে আছেন। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন বিজ্ঞানী বেনহাম। তিনি ৪০ বছর ধরে ইহুদিদের এই প্রজেক্টের প্রধান হিসেবে কাজ করছেন'।

'এর উপর ইহুদিদের প্রজেক্ট আছে?'

‘হ্যাঁ আছে’।

‘কেন?’

হাসল পিয়েরে পল। বলল, ‘আপনি শিশুর মত প্রশ্ন করলেন মিঃ সোম্বা। জুইস ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (JIO) ইহুদিবাদ বিরোধীদের কুপোকাত করার জন্যে ‘মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণ’কেই প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। আরব ও মুসলিম জগতের শত শত নেতার উপর তারা এই পদ্ধতির প্রয়োগ করেছে। এটা আমার বানানো কথা নয় মিঃ সোম্বা। ফিনল্যান্ডের ‘হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়’- এর অধ্যাপক B. Kwan Choe তার ‘The Social Reality of Artificial Mind and Body Control’ শীর্ষক ১৩৪ পৃষ্ঠার এক নিবন্ধে বলেছেন, ‘ইহুদিবাদীরা তাদের নিজেদের হাত নিরাপদ রাখার জন্যে ‘মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণ’ ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্যকে তাদের বাঞ্ছিত হত্যা ও অন্যান্য অপরাধ সংঘটনে বাধ্য করে। কেনেডি, রবার্ট কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং, জর্জ ওয়ালেস-এর হত্যাকান্ড এই ব্যবস্থারই ফল। ইহুদিবাদ বিরোধী বহু আরব নেতাকে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বিসর্জন দিতে হয়েছে, এমনকি তারা জীবন দিয়েছে এই ব্যবস্থার ফাদে পড়েই। এসব দ্বারা ইহুদিবাদীরা তাদের বড় বড় স্বার্থ হাসিল করেছে। সুতরাং ‘কেন’ তাদের প্রজেক্ট, এ জিজ্ঞাসার কোন অবকাশ নেই’।

‘কিন্তু এত বড় অস্ত্র ইহুদিরা মনোপলি করে রেখেছে। আমরা এর সন্ধান পাইনি কেন?’

‘মিঃ সোম্বা, বুঝতে পারছেন এসব কাজও তো ওদের মনোপলি। ওরা যেভাবে ওদের জাতির জন্যে কাজ করে, আমরা করিনা। জাতির জন্যেই তারা এ অস্ত্রের সন্ধান করেছে এবং প্রয়োগ করছে’।

‘কেন, জাতির জন্যে তো আমরাও কাজ করছি? গোটা দুনিয়াতেই আমাদের খৃষ্টান মিশন আছে, আমাদের এনজিও আছে। কিন্তু আমরা তো এ অস্ত্রের চিন্তা করি নি’।

‘না করার একটা কারণ হলো, আমাদের খৃষ্টানদের সংখ্যা বেশী, শক্তিতেও বড়। সুতরাং আমরা যা চাই তা এমনিতেই করতে পারি। কিন্তু

ইহুদিদের সংখ্যা খুব অল্প। ধর্মান্তরের মাধ্যমে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিরও কোন উপায় নেই। কারণ বনি ইসরাইল বংশের লোক হওয়া ছাড়া কেউ ইহুদি হতে পারে না। সুতরাং খুব কম সংখ্যক মানুষ নিয়ে তারা তাদের দুনিয়া জোড়া স্বার্থ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে। এজন্যে বৃদ্ধিই তাদের প্রধান হাতিয়ার। 'মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণ' এই বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ারেরই একটি'।

'চমৎকার, চমৎকার বলেছেন মিঃ পিয়েরে পল। ইহুদিদের মত প্রয়োজন এখন আমাদেরও দেখা দিয়েছে'।

'ঠিক বলেছেন। প্রয়োজন আমাদেরও দেখা দিয়েছে। আমাদের সংখ্যা, সামর্থ, অর্থ সবই আছে। কিন্তু মুসলমানদের আদর্শ- বিশ্বাসের মোকাবিলা করার কোন অস্ত্র আমাদের নেই। এই ক্ষেত্রেই আমরা প্রচন্ড রকম মার খেয়ে যাচ্ছি। আমাদের এই পরাজয় এড়াবার জন্যেই ইহুদিদের পথ আমাদের অনুসরণ করা দরকার। এই ক্ষেত্রে ওমর বায়া হবে আমাদের প্রথম শিকার'।

'ধন্যবাদ মিঃ পিয়েরে। আমরা এ জন্যে আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব। আমরা যদি, ওমর বায়াকে হাতের মধ্যে এনে তাকে দিয়েই কাজ সারাতে পারি, তাহলে সেটা যে কি আনন্দের হবে। আমাদের বদনামও অনেক চলে যাবে। মুসলমানরা প্রপাগান্ডা করে, আমরা নাকি নানা ছলে বলে কৌশলে মুসলমানদের ভুমি দখল করে চলেছি। ওমর বায়া যদি নিজেই গিয়ে তার জমি আমাদের লিখে দেয়, তাহলে ঐ প্রপাগান্ডার মুখে প্রথমবারের মত কিছু ছাই গিয়ে পড়বে'।

'কিন্তু এই লাভের জন্যে বিরাট মূল্যও দিতে হবে মিঃ সোম্বা'।

'কি মুসা?'

'আমাদের সাথে আপনাদের যে টাকার চুক্তি, বিজ্ঞানী বেনহামের সম্মানী তার বাইরে হবে'।

'আমরা রাজি। কত টাকা?'

'আনুসঙ্গিক সব খরচ সমেত মাত্র দুই লাখ ডলার'।

'রাজী, মিঃ পিয়েরে'।

'চলুন, উঠা যাক'।

'কোথায়?'

'বিজ্ঞানী ডঃ বেনহামের সাথে দেখা করতে'।

'ডঃ বেনহাম? কোথায় উনি?'

'উনি তো এসেছেন। আনা হয়েছে তাকে। তিনি হোটেলে আমাদের অপেক্ষা করছেন'।

'হিপ হিপ হুররে। চলুন তাহলে'। বলে শিশুর মত চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল মিঃ সোম্বা।

উঠল মিঃ পিয়েরে পলও। হোটেলে পৌছাল তারা। নক করল গিয়ে ডঃ বেনহামের কক্ষে।

ভেতর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে মিঃ পিয়েরে চাপ দিল দরজায়।

দরজা খোলাই ছিল। খুলে গেল।

ঘরে প্রবেশ করল মিঃ পিয়েরে পল এবং মিঃ মাইকেল সোম্বা।

বিজ্ঞানী ডঃ বেনহাম তার টেবিলে বসে বই পড়ছিল।

ডঃ বেনহাম দীর্ঘকায়। হাল্কা-পাতলা গড়ন। সেমেটিক চেহারা। অর্থাৎ ডঃ বেনহাম একজন ইহুদি।

বইয়ের মধ্যে ডুবেছিল ডঃ বেনহাম।

মিঃ পিয়েরে তার দিকে এগিয়ে বলল, 'গুড মর্নিং ডঃ বেনহাম'।

ডঃ বেনহাম মাথা তুলে বলল, 'গুড মর্নিং'। কিন্তু আসন থেকে উঠলেন না ডঃ বেনহাম। ইংগিতে বসতে বলল সামনের সোফায়। ডঃ বেনহামের প্রশ্ন বোধক দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মাইকেল সোম্বার উপর।

মিঃ পিয়েরে বলল, 'ইনি মিঃ মাইকেল সোম্বা। যে কাজের জন্যে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি, সে কাজটা এদেরই'।

ডঃ বেনহাম ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, 'কাজের কথায় আসা যাক মিঃ পিয়েরে'।

'জি, আমরা প্রস্তুত'।

'আমি কিছু শুনেছি, তবু এখন বলুন আপনারা কি চাচ্ছেন?'

'ওমর বায়া একজন মুসলিম যুবক। তার বাড়ি ক্যামেরুন। সোম্বাদের এস্টেটের মাঝখানে ওমর বায়ার দশ হাজার একর জমি আছে। এই জমিটা ওমর

বায়া স্বেচ্ছায় গিয়ে ‘আর্মি অব ক্রাইস্ট অব ওয়েস্ট আফ্রিকা’র কাছে হস্তান্তর করবে। এই ব্যবস্থা আপনি করবেন’।

‘জমি হস্তান্তরে কেন রাজী নয় ওমর বায়া?’

‘প্রথম কারণ জমি বিক্রির কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আসল কারণ হলো, তারা বলছে খৃষ্টানরা এই ভাবে ভুমি কিনে বা দখল করে গোটা দক্ষিণ ক্যামেরুন শুন্য করে ফেলেছে। এখন ওমর বায়ার জমিটুকু বিক্রি হয়ে গেলেই গোটা দক্ষিণ ক্যামেরুনে মুসলমানদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়। এই কারণেই ওমর বায়া জমি বিক্রিতে রাজী নয়। অন্যদিকে এই জমি না হলে খৃষ্টানদের পরিকল্পনা পূর্ণ হয় না, শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখিন হতে পারে’।

‘বুঝেছি। এখন বলুন ওমর বায়া লেখা পড়া কি জানে?’

প্রশ্নটির উত্তর মিঃ পিয়েরে পলের জানা নেই। সে তাকাল মিঃ সোম্বার দিকে।

সোম্বার মুখেও বিব্রত ভাব ফুটে উঠল। বলল, ‘এ ব্যাপারে সঠিক কোন তথ্য আমার জানা নেই’।

‘সে কি বিবাহিত’।

‘জি না’। বলল সোম্বা।

‘এক্ষেত্রে তার কোন চয়েস আছে? অর্থাৎ কাউকে সে ভালবাসে কিনা?’

‘এটাও আমাদের জানা নেই’।

‘সে নিয়মিত প্রার্থনা ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে কিনা?’

‘এটাও জানা নেই’ বলল সোম্বাই।

‘এছাড়া অন্য কোন ধরণের লেখা ও সাহিত্য সে পছন্দ করে?’

‘জানা নেই জনাব’।

‘আনন্দের সময় কাকে সে সাথী হিসেবে নেয়? আবার দুঃখ ও বিপদের সময় কার উপর সে নির্ভর করে?’

‘আমরা জানি না’।

‘এই যে জমি সে দিচ্ছে না, এটা তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত, না কারও বুদ্ধিতে সে এটা করছে?’

‘এই ক্ষেত্রে সে তার পিতাকে অনুসরণ করছে। তার পিতাও এ ব্যাপারে আপোশহীন ছিল’।

‘সে অন্তঃমুখী ধরণের লোক, না বহিঃমুখী?’

‘সে খুব চাপা ধরণের ছেলে। কম কথা বলা অভ্যাস’।

‘জীবন যাপনের ব্যাপারে ইসলাম ধর্মের বহু বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ আছে। সে কি এসব পুরোপুরি মেনে চলে?’

‘বন্দী অবস্থায় নামায তাকে পড়তে দেখা যাচ্ছে। তবে নিয়মিত পড়ে কিনা জানি না। ধর্মের সব নীতি ও বিধান মেনে চলে কিনা বলতে পারব না। তবে একথা ঠিক যে, ইসলাম ধর্মের প্রকৃত ও পূর্ণ শিক্ষা অর্জনের সুযোগ ক্যামেরুনে নেই’।

‘সে কি হজ্জ করেছে?’

‘আমরা জানি না’।

‘কতকগুলো মানুষের প্রকৃতি এমন আছে যারা শক্তিকেও প্রতিরোধ করতে পারে, আবার আদর এবং প্রশংসাকেও প্রতিরোধ করতে পারে। আবার কেউ আছে শক্তিকে সে প্রতিরোধ করতে পারে, কিন্তু আদর বা প্রশংসার কাছে ভেঙে পড়ে। ওমর বায়া কোন ধরণের লোক?’

‘শক্তি প্রয়োগকে ওমর বায়া পরাভূত করেছে কিন্তু আদরের ব্যাপারটা পরীক্ষা করা হয় নি’।

‘ওমর বায়া যে স্কুল বা কলেজে পড়তেন, সেখানে তিনি নিয়মিত ছিলেন কিনা?’

‘আমরা এটা পরীক্ষা করিনি’।

‘পোষাক-পরিচ্ছেদ, চলা-ফিরা ও সাজান-গোছানোতে সে কি টিপ-টপ?’

‘এ তথ্যও আমাদের কাছে নেই’।

‘সে কোন রংয়ের পোষাক পরে কিংবা কোন রং পছন্দ করে তা কি আপনারা জানেন?’

‘খোঁজ না নিয়ে বলা যাবে না’।

‘কোন ধরণের খাবার সে পছন্দ করে?’

‘এটাও আমাদের জানা নেই’।

‘আচ্ছা আপনারা তো তার উপর অনেক দৈহিক নির্যাতন চালিয়েছেন। সে কি মুখ বুজে সব সহ্য করার ক্ষমতা রাখে, না মাঝে মাঝে চিৎকার করে?’

‘মাঝে মাঝে চিৎকার করেছে’।

‘তার হাতের লেখা দেখেছেন? তার হাতের লেখা কি পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট ও সমমাত্রিক, না বিশৃঙ্খল? একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের লেখা হয় কিনা, বানান ভুল করা তার অভ্যেস কিনা?’

‘দুঃখিত এ তথ্য আমাদের জানা নেই’।

‘তার হার্টবিট, রক্তচাপ, হরমোন, চোখের তারার মাপসহ দৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি আপনারা রেকর্ড করেছেন কি?’

‘না, এগুলো আমরা প্রয়োজন মনে করিনি’।

বিজ্ঞানী ডঃ বেনহাম আর কোন প্রশ্ন করল না। একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, ‘মুসলমানদের বিরুদ্ধে আপনাদের লড়াইয়ে আমি আপনাদের সাহায্য করতে রাজী হয়েছি এবং সাহায্য করব। কিন্তু আমার এ সাহায্যের পথটা খুবই জটিল। এজন্যে আপনাদেরকেও কিছু কাজ করতে হবে’।

একটু থামল ডঃ বেনহাম। তারপর আবার শুরু করল, ‘মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যাপারটা একটা জটিল প্রক্রিয়া। যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই, ব্রেনওয়েভ ট্রান্সমিশন এবং অপটো-ইলেক্ট্রনিক্যাল কনট্রোল কৌশলের মাধ্যমে ভেতর থেকে তার মনোদৈহিক পরিবর্তন আনতে হবে। এজন্যে তার স্বভাব-প্রকৃতি, মেজাজ-মর্জি, বিশ্বাস-কর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। তাহলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কাজটা সহজ হয়ে যায়। সুতরাং যে প্রশ্নগুলো আমি করলাম তার জবাব সংগ্রহের চেষ্টা করুন। ওমর বায়াকে আপনারা কোথায় রেখেছেন?’

‘আমাদের এক ঘাটিতে বন্দী আছে’।

‘বন্দী যখন হয়ে গেছে, তখন ছেড়ে দিলে তার উপর কাজ করার সুযোগ হবে না। সুতরাং বন্দী তাকে রাখতে হবে কিন্তু তাকে বন্দী পরিবেশে বাঁধা যাবে না। অর্থাৎ ঐ পরিবেশে থাকলে সে অহরহ বন্দীত্বের চাপ অনুভব করবে এবং

একটা প্রতিরোধ স্পৃহা তার মধ্যে জাগরুক থাকবে, সে পরিবেশে তাকে রাখা যাবে না'।

'সেটা কিভাবে সম্ভব?' বলল পিয়েরে পল।

'বলছি। তাকে এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখান থেকে তার পালাবার সুযোগ থাকবে না। কিন্তু ভেতরে সে তার বাড়ির মতই স্বাধীন পরিবেশে থাকবে। এ ঘর থেকে সে ঘরে যাওয়া, টয়লেট ড্রইং রুমে যাওয়া, ব্যায়াম পায়চারী করা, ইচ্ছা ও পছন্দমত খাওয়া, বই পড়া, গান-বাজনা করা, গল্প ও হাসি-ঠাট্টা করা, ফিল্ম দেখা, ইত্যাদির তার সুযোগ থাকতে হবে। যাতে করে তার মনের উপর কোন চাপ না থাকে। আর তাকে একজন উপযুক্ত সংগী দিতে হবে। সে সুন্দরী, বুদ্ধিমতি ও বাকপটু হবে। তাকে নিয়োগ করা হবে ওমর বায়ার পরিচারিকা হিসেবে। কিন্তু ওমর বায়াকে দৈহিক ভাবে জয় করাই হবে তার কাজ। ওমর বায়ার চরিত্র যদি নষ্ট করা যায়, তাহলে তার আদর্শিক প্রতিরোধ ধ্বসে পড়বে। সেই পরিবেশে তার উপর মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কাজ সহজ হবে। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, আদর্শবাদী মুসলমান, এমনকি আধা আদর্শবাদী মুসলমানকেও ইচ্ছামত মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণে আনা যায় না। তাদের মানসিক প্রতিরোধটা এতটা সবল ও সক্রিয় থাকে যে বিপরীতমুখী ব্রেনওয়েভ ট্রান্সমিশন এবং অপটো-ইলেক্ট্রনিক্যাল কনট্রোল প্রচেষ্টা বার বার তার কাছে ধ্বসে পড়ে। এ জন্যে সব ক্ষেত্রেই প্রথম প্রদ্যোগ নেয়া হয়েছে মুসলমানদের চরিত্র নষ্ট করার। মদ, টাকা, সুন্দরী নারী- এই তিনটিকেই ব্যবহার করা হয়েছে তাদের নষ্ট করার জন্যে। সত্যিকার আদর্শবান মুসলমান যারা, তাদের ক্ষেত্রে এ অস্ত্রও কোন কাজ দেয়নি। তবে আধা আদর্শনিষ্ঠরা আদর্শহীনদের মতই কিছুটা সুযোগ সন্ধানী হয়। তাদের ক্ষেত্রে এই তিনটি অস্ত্র ব্যবহার করে ফল পাওয়া গেছে। তাদের চরিত্র নষ্ট করার পর তাদেরকে খুব সহজেই মনোদৈহিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এনে যা ইচ্ছে তাই করানো হয়েছে। ওমর বায়ার ক্ষেত্রে অর্থ ও মদ কোন কাজ দেবে না। সুন্দরী ও বুদ্ধিমতি নারী দিয়ে তাকে সহজেই জয় করা যাবে, কারণ সে অবিবাহিত। আপনাদের এই চেষ্টাই করতে হবে'।

'আপনার কাজ কখন শুরু হবে?' বলল মিঃ পিয়েরে পল।

‘ওমর বায়াকে নতুন পরিবেশে স্থানান্তর করার পর আমার কাজ শুরু হবে। যে মেয়েকে ওমর বায়ার সংগী নির্বাচন করবেন, তার কাছ থেকে আমি যদি সহযোগিতা পাই, তাহলে দ্রুত ফল পাওয়া যাবে। সুতরাং মেয়েটির সিলেকশন ভাল হওয়া চাই’।

‘চিন্তা করবেন না, ব্ল্যাক ক্রস-এর মহিলা স্কোয়াড সবদিক দিয়েই যোগ্য। তাছাড়া তাদের যোগাযোগের মধ্যে বহু ভালো মেয়ে রয়েছে। টাকা হলে বাঘের চোখ মিলে মিঃ বেনহাম’। বলল পিয়েরে পল।

‘আর কিছু?’ বলল ডঃ বেনহাম।

‘আর কিছু নেই ধন্যবাদ’। বলে মিঃ পিয়েরে পল উঠে দাঁড়াল। উঠল মিঃ সোম্বাও।

বিজ্ঞানী ডঃ বেনহাম আবার মনোযোগ দিল তার বইতে।

ওমর বায়া লক্ষ্য করছিল, তার সাথে ব্ল্যাক ক্রস-এর লোকদের খারাপ ব্যবহার কমে গেছে। একটু ভালো খাবার-দাবারও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ ব্ল্যাক ক্রসের লোকরা তার সাথে খুবই ভালো ব্যবহার করতে লাগলো। খাবারের মানও হঠাৎ উন্নত হয়ে গেল। সে বিস্মিত হয়ে ব্ল্যাক ক্রসের একজন লোককে, যে তাকে সেদিন খাবার দিতে এসেছিল, জিজ্ঞাসা করল। লোকটি বলল, ‘আমরা কিছু জানি না স্যার। মানুষের মমতা সব সময় এক রকম থাকে না। শত্রু মিত্র হয়ে যায়, মিত্রও শত্রু হয়ে যায়’।

ওমর বায়া ভেবে পেল না, তার সম্পর্কে ব্ল্যাক ক্রসের মত পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব। ওমর বায়া কিভাবে ব্ল্যাক ক্রস-এর মিত্র হতে পারে? সব ভাবনার পর ভাবল, আল্লাহর সাহায্যও তো কোনভাবে আসতে পারে!

সেদিন রাত ১২টা। ওমর বায়া শুয়ে পড়েছে কিন্তু ঘুমায়নি। পিয়েরে পল প্রবেশ করল তার ঘরে। দাঁড়াল এসে ঘরের মাঝখানে।

ওমর বায়া শুয়ে থেকেই তার দিকে পাশ ফিরল।

ওমর বায়া পাশ ফিরতেই পিয়েরে পল বলল, 'আমি দুঃখিত ওমর বায়া। তোমাকে কষ্ট করতে হবে। আমরা এ জায়গা বদলে ফেলতে চাই। আজ রাতেই। একটু পরে তোমাকে নিয়ে যাবে'।

ওমর বায়া কোন কথা বলল না। তবে পিয়েরে পলের কথায় অবাকই হলো। পিয়েরে পল কোন ব্যাপারে ওমর বায়ার কাছে দুঃখ প্রকাশ এই প্রথম করল।

পিয়েরে পল কথা শেষ করে যাবার জন্যে ঘুরে দাড়িয়েই আবার থমকে গেল। ওমর বায়ার দিকে আবার ঘুরে দাঁড়াল সে। বলল, 'ওমর বায়া, তোমার বড় ধরনের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'আটক ব্যক্তির এসব নিয়ে ভাবার অবকাশ কোথায়?'

'দেখ, তোমার প্রতি অবিচার হয়েছে। আমরা এখন মত পাল্টেছি। কোন কিছুতে তোমাকে বাধ্য করা আমাদের দায়িত্ব নয়। 'ওকুয়া'র সাথে আমাদের চুক্তি ছিল, আমরা তোমাকে আটকে রাখার দায়িত্ব পালন করব, তোমাকে দিয়ে যদি কিছু করাতে হয় তারা তা করাবে। আমরা নই। শুরুতে অর্থের প্রলোভনে আমাদের লোকদের তারা মিসগাইড করেছে। আমরা আর সেটা হতে দিচ্ছি না। তাদের কাজ তারা করবে, আমাদের কাজ আমরা করব। তোমার সাথে আমাদের কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। সুতরাং তোমাকে আটকে রাখা ছাড়া তোমার প্রতি আমাদের পক্ষ থেকে আর কোন অবিচার হবে না'।

কথা শেষ করেই ঘুরে দাড়িয়ে চলে গেল পিয়েরে পল। ওমর বায়ার কোন কথা শুনার অপেক্ষাও করল না।

ওমর বায়া সত্যিই অবাক হলো পিয়েরে পলের কথায়। একটু খুশীও হলো। যাক, পিয়েরে পলের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে ব্ল্যাক ক্রসের খারাপ আচরণ থেকে অন্তত বাঁচবে সে। কিন্তু পিয়েরে পল কি সত্য কথা বলেছে? মিথ্যা বলবে কেন? ওমর বায়াতো তাদের কাছ থেকে কিছু চায়নি। তাছাড়া পিয়েরে পলের কথা যে সত্য, তার প্রমাণও তো ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। ব্ল্যাক ক্রস এখন থেকে তাকে ভাল খাবার দিচ্ছে এবং ব্ল্যাক ক্রস-এর লোকেরা তার সাথে

বলা যায় ভালই ব্যবহার করছে। অবশেষে সে ভাবল পিয়েরে পলের কথা সত্যি হোক মিথ্যা হোক তার হারাবার কিছু নেই। যে খারাপ অবস্থায় সে পৌছেছে, মৃত্যু ছাড়া এর চেয়ে বড় আর কিছু আছে!

নিজের অবস্থার কথা ভাবতে গিয়ে তার মনে পড়ল তার মায়ের কথা, তার আব্বার কথা, ছোটবেলার স্মৃতি বিজড়িত তাদের সেই সবুজ উপত্যকার কথা এবং সহজ-সরল তার জাতির লোকদের কথা। এখন সে সব কিছুই নেই। তার আব্বার মৃত্যুর পরই খৃষ্টান মিশনারী ও খৃষ্টান এনজিওদের দৌরাত্ম বেড়ে যায়। তার পিতার স্থান সে পূরণ করতে পারে নি। ফলে খৃষ্টান মিশনারী ও খৃষ্টান এনজিওদের গোপন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন 'আর্মি অব ক্রাইস্ট অব ওয়েস্ট আফ্রিকা' (ওকুয়া)-এর হাতে পরাজিত হতে লাগল মুসলমানরা। জমি ও ঘর-বাড়ি হারিয়ে মুসলমানরা বিতাড়িত হলো দক্ষিণ ক্যামেরুন থেকে। ওমরা বায়াকেও পালাতে হলো। তার মা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলো 'ওকুয়া'র হাতে। আজ সে নিজেও 'ওকুয়া'র হাতে বন্দী। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল ওমর বায়া। 'ওকুয়া'দের পেছনে, খৃষ্টান মিশনারী ও খৃষ্টান এনজিওদের পেছনে রয়েছে পাশ্চাত্যের দেশগুলো। অসহায় মুসলমানদের কোন সাহায্যকারী নেই। ইসলামের নামে, মুসলমানদের নামে কোন সাহায্য করাকে 'মৌলবাদ' বলা হচ্ছে, বলা হচ্ছে একে সাম্প্রদায়িকতা। এটা বলা হচ্ছে এই কারণে যাতে ইসলাম ও মুসলিম নামের সংগঠনগুলো কাজ করার সুযোগ না পায়। মুসলিম বিশ্বের অনেক সরকার তাদের ফাদে পড়ে 'মৌলবাদ' ও 'সাম্প্রদায়িকতা' বিরোধিতার নামে ইসলাম ও মুসলমানদের অগ্রগতি রুদ্ধ করছে।

পাশ ফিরল ওমর বায়া। ভাবনা তার অন্যদিকে মোড় নিল, সেকি কোন দিন মুক্তি পাবে এদের কবল থেকে। ব্ল্যাক ক্রস কয়দিন তার সাথে এই ভাল ব্যবহার করবে। এক সময় নিশ্চয় তাকে তুলে দেবে 'ওকুয়া'র হাতে। 'ওকুয়া' তাকে কি করবে সে ভালো করেই জানে। মনে পড়ল আহমদ মুসার কথা। তিনি কি জানতে পেরেছেন ওমর বায়ার কথা? জানতে পারলে কি হবে, তিনি কতদিক সামলাবেন। ফিলিস্তিন দূতাবাসের লোকদের কাছ থেকে সে আহমদ মুসার গল্প শুনেছে। কত বড় বড় কাজ তিনি করেছেন এবং করছেন। এক ওমর বায়ার কথা

ভাববার কি তার সময় আছে! এমন আশা করাও স্বার্থপরতা। একজন ব্যক্তির চেয়ে জাতি অনেক বড়। সেই জাতির কাজে তিনি ব্যস্ত। না, তার আসার দরকার নেই।

ভাবনা আর এগুতে পারল না ওমর বায়ার। পায়ের শব্দে সে ফিরে তাকাল। দেখল ঘরের ভেতরে চারজন লোক। ওমর বায়া তাদের দিকে তাকাতেই বলল, 'আপনি উঠুন। আমরা এখনি যাত্রা করব'।

উঠল ওমর বায়া।

ওমর বায়া বিস্মিত হলো, তাকে এবার ওরা বাধল না। এ পর্যন্ত সে তিনবার স্থান পরিবর্তন করেছে। প্রত্যেক বারই তার হাত-পা বেধে পশুর মত গাড়িতে ছুড়ে ফেলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

চারজন তাকে চারদিক থেকে ঘিরে নিয়ে চলল। তাদের প্রত্যেকেরই পকেটে হাত। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেরই হাতে রিভলবার। বাড়ির ভেতরের চত্তরে দাড়িয়েছিল গাড়ি। মাইক্রোবাস। জানালাগুলোতে রঙীন কাঁচ লাগানো।

বাইরে আরো দু'জন দাড়িয়েছিল। তাদের হাতে স্টেনগান।

ওমর বায়াকে গাড়ির মাঝখানে বসিয়ে চারদিকে ঘিরে থাকল ওরা পাঁচজন। স্টেনগান ধারী একজন ড্রাইভারের পাশে বসেছিল।

গাড়ি চলতে শুরু করল। সাত ঘন্টা ধরে চলল গাড়ি।

কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? ফ্রান্সের বাইরে কোথাও? ওমর বায়া জিজ্ঞাসা করেও এর জবাব পায়নি। ভদ্র কন্ঠের উত্তর পেয়েছে, 'আমাদের কিছু বলার হুকুম নেই। আপনি কর্তাকে জিজ্ঞাসা করলেই ভাল করতেন'।

অবশেষে গাড়ি থামল।

গাড়ির দরজা খুলে গেল।

ওমর বায়া গাড়ি থেকে নেমে দেখল একটা বাড়ির চত্তরে সে নামল। চত্তরটির চারদিক দিয়েই বাড়ির দেয়াল। একটা করিডোর দিয়ে গাড়ি প্রবেশ করেছে এ চত্তরে। করিডোরটির মুখেও দরজা।

'চলুন'। বলে একজন স্টেনগানধারী ওমর বায়াকে সামনের একটা দরজার দিকে যাবার ইংগিত করল।

ওমর বায়া চলল সেদিকে।

দু স্টেনগানধারীর একজন ওমর বায়ার আগে, অন্যজন তার পেছনে।

ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল।

তারা একটা করিডোর ধরে এগিয়ে চলল। করিডোরটি শেষ হলো আর একটা গেটে। গেটে তারা দাড়াল। স্টেনগানধারীদের একজন ওমর বায়াকে বলল, এই বাড়িতে আপনি থাকবেন। সম্মানের সাথে রাখা হবে। কিন্তু আপনি যদি পালাবার কোন প্রকার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি ভয়ানক বিপদ ডেকে আনবেন। আপনাকে অসম্মান করার হুকুম নেই কিন্তু পালাতে চেষ্টা করলে হত্যা করার হুকুম আছে। চেয়ে দেখুন, বাড়িটার চারদিক স্টেনগানধারী সার্বক্ষণিক প্রহরী দাড়িয়ে আছে। বাড়ির ভেতরে রয়েছে বাবুর্চী ও ফায়ফরমাস খাটার লোকজন। তারা সকলেই ব্ল্যাক ক্রস-এর লোক। আর আপনাকে দেখা শুনার জন্য রয়েছে একজন পরিচারিকা। আপনি গন্ডগোল না করলে খুব ভালই থাকবেন'।

কথা শেষ করে দরজায় নক করল লোকটি।

দরজা খুলে গেল।

দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান একজন ভীমাকৃতির লোক খোলা দরজায় দাড়িয়ে। তার দেহটা যত বড় তার মাথাটা তত ছোট। ছোট মাথাটি কামিয়ে বেল করা। অথবা মাথায় কোন দিন চুলই ওঠেনি। মুখটি তার মালভূমির মত এবড়ো-থেবড়ো। সাপের মত কুতকুতে ছোট দুটি চোখ।

লোকটিকে দেখে ওমর বায়ার কিছু ভয়ও হলো, তার সাথে সৃষ্টি হলো প্রবল এক বিতৃষ্ণার। এই ক্রিমিনালটার সাথেই তাকে থাকতে হবে।

স্টেনগানধারী সেই লোকটি দরজায় দাড়ানো মানুষ নামক পিন্ডটাকে লক্ষ্য করে বলল, 'মশিয়ে লিটল, ইনিই আমাদের মেহমান। একে মিস এলিসা গ্রেস-এর কাছে নিয়ে যাও'। বলে ওমর বায়াকে ইংগিত করল ভেতরে যাওয়ার।

ওমর বায়া ঢুকে গেল ভেতরে।

ভেতরে ঢুকে দেখতে পেল, ফাঁকা চত্বরের উপর ছবির মত সুন্দর একটা বাংলো। চারদিক দিয়ে প্রাচীর ঘেরা। উপরে সুন্দর নীল আকাশ। বাতাসে সমুদ্রের লোনা গন্ধ। সেকি তাহলে সমুদ্রের তীরে কোথাও?

চত্তরটাকে ভূমি সমতল থেকে অনেক উচু বলে মনে হচ্ছে ওমর বায়ার কাছে। তাহলে চত্তরের নিচেও কি বাড়ি-ঘর আছে। না পাহাড়ের কোন টিলায় বাড়িটা?

খুব ভালো লাগল বাড়িটা ওমর বায়ার।

ওমর বায়া হাটছিল মশিয়ে লিটল নামক মানুষ পিন্ডটার পেছনে পেছনে।

এক জায়গায় এসে লোকটি ওমর বায়ার সামনে থেকে এক পাশে সরে হাঁটতে লাগল আবার সেই গেটের দিকে।

মশিয়ে লিটল- এর দেয়াল সামনে থেকে সরে যেতেই ওমর বায়ার চোখ গিয়ে পড়ল সামনের একটা ঘরের দরজায় দাঁড়ানো একটা তরুণীর উপর।

প্রথম দৃষ্টিতেই ওমর বায়ার মনে হলো সে পটে আকা একটা নিখুঁত ছবি দেখছে। কিন্তু ছবিটির যখন ঠোঁট নড়ে উঠল ভুল ভাঙল ওমর বায়ার। কষ্ট করে চোখ সে নামিয়ে নিল তার দিক থেকে।

‘আসুন। আমার নাম এলিসা গ্রেস। ভেতরে আসুন। আপনার কক্ষে আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি’। মিষ্টি কন্ঠে স্বাগত জানাল মেয়েটি।

মশিয়ে লিটল নামক লোকটিকে দেখে ওমর বায়ার মনটা যতখানি খারাপ হয়ে উঠেছিল, সেটা এখন আর নেই।

মেয়েটি দরজার এক পাশে সরে দাড়িয়েছিল।

ওমর বায়া প্রবেশ করল কক্ষটিতে।

পরবর্তী বই

ব্ল্যাক ক্রসের মুখোমুখি

কৃতজ্ঞতায়ঃ Md. Jafar Ikbal Jewel